বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দর্শন

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে
বিশেষ সংখ্যা

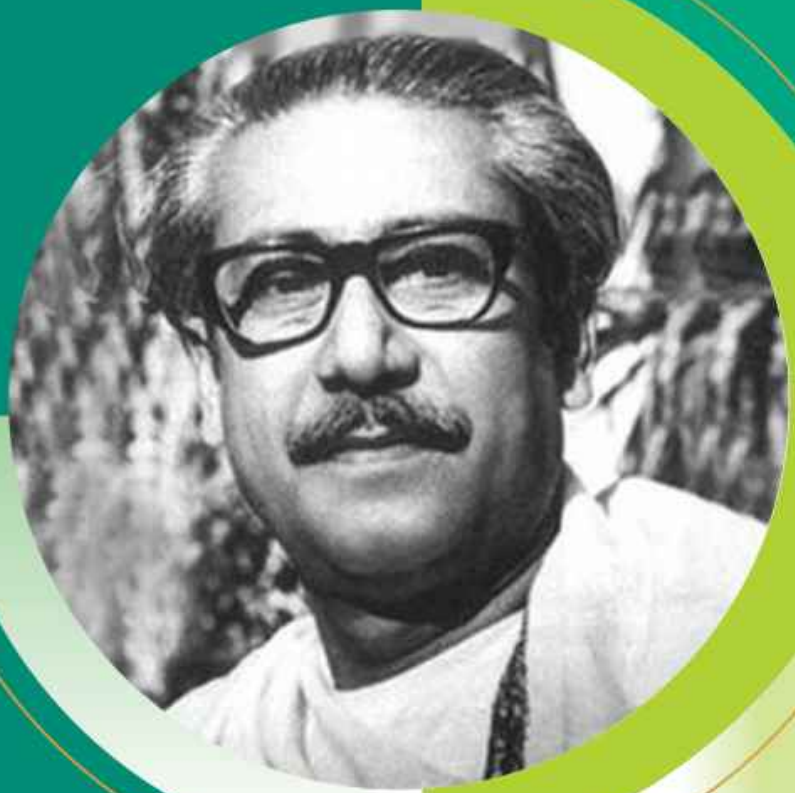

এস এম ই
ফাউন্ডেশন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব
এসএমই ডেভেলপমেন্ট

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এসএমই ডেভেলপমেন্ট

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দর্শন

এসএমই ফাউন্ডেশন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এসএমই ডেভেলপমেন্ট
মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা

প্রচ্ছদ ও অলংকরন:
মোঃ হারুন-অর-রশীদ (টুটুল)

কপিরাইট ©২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশন

আইএসএসএন: ২৩০৫-৭৭৫০

প্রকাশকাল:
জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
জুন ২০২১

প্রকাশনায়:
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)
পর্যটন ভবন (লেভেল ৬-৭), ই-৫, সি/১, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ইমেইল: info@smef.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.smef.gov.bd

মূল্য: ১০০ টাকা

সম্পাদনা পর্ষদ

ড. মোঃ কামাল উদ্দিন, প্রধান সম্পাদক
অধ্যাপক
ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. মনজুর হোসেন, সদস্য
গবেষণা পরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ।

ড. নাজনীন আহমেদ, সদস্য
কান্ট্রি ইকোনোমিস্ট
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)।

ড. ইজাজ হোসেন, সদস্য
অধ্যাপক (অব.), কেমিকৌশল বিভাগ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ড. জাহিদ উল আরেফীন চৌধুরী, সদস্য
সহযোগী অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মুখবন্ধ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি আমি বিনম্র শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে জাতীয় ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে এসএমই ফাউন্ডেশন 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দর্শন' শীর্ষক বিশেষ জার্নাল প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাঙালি জাতির জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবনব্যাপী যে সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ, তারই চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালে মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সে উন্নয়নে সকল শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধু ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্প, বানিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়ক মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ধারায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্রশিল্প করপোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপ বাংলাদেশে ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা; যারই ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনকেই এগিয়ে নিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দর্শন' বিষয়ক বিশেষ জার্নালে লেখকবৃন্দ বাঙালি জাতির মহান নেতার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনের নানাদিক ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেছেন। আমি এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বিশেষ জার্নালের লেখকবৃন্দকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ লেখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি এই জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ আমাদের ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন অনুধাবন করতে সাহায্য করবে। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনকে পাথেয় করে আগামী দিনের একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন ও ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশিত একটি উন্নত দেশ গঠনে আমরা অনুপ্রাণিত ও সচেষ্ট হবো, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ড. মোঃ মাসুদুর রহমান
চেয়ারপার্সন
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা নম্বর
বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ভাবনা ড. আতিউর রহমান	০১
বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন: বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা ড. খন্দকার বজলুল হক	১১
বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন ও বাংলাদেশ ড. এম. খায়রুল হোসেন	২৩
বঙ্গবন্ধুর শিল্পনীতি: উন্নত জাতিতে যুক্ত হওয়া একটি বিন্দু ড. মোঃ মাসুদুর রহমান ড. মোহাম্মদ শরীয়ত উল্লাহ	৪১
বাংলাদেশের অর্থনীতি ও এসএমই খাতের উন্নয়ন: একটি পর্যালোচনা ড. মনজুর হোসেন	৫১
বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দর্শন ড. শাহ্ মোঃ আহসান হাবীব	৭৩
বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন ও বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান: একটি সমীক্ষা ড. রাজিয়া বেগম	৮৭

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ভাবনা

ড. আতিউর রহমান *

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ভাবনাসমূহই তাঁর রাজনৈতিক কৌশলকে নির্ধারণ করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রটিই ছিল অবাস্তব। দেড় হাজার মাইলের মতো ভৌগোলিক দূরত্বে থাকা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শুরু থেকেই যে অর্থনৈতিক বৈষম্য গড়ে উঠেছিল তার পেছনে শক্তিশালী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একচোখা নীতি কাজ করেছিল। সম্পদের অসম বণ্টন ও ব্যবহারের ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যাচ্ছিল। অথচ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বাস ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। এদের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বঞ্চনার কথা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী স্বীকারই করতে চাইত না। সংবিধান পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার না দিলে যে এই পরিস্থিতি বদলাবে না– এ কথাটি বাঙালিদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হিসেবে গেঁথে গিয়েছিল। আর এই বাস্তবতাতেই পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের মানুষ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে কঠোর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। শুরু থেকেই বৈষম্য দূর করার এই আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই আন্দোলনের এক পর্যায়ে ৬-দফা পেশ করেন তিনি। আর সেজন্য তাঁকে জেল-জুলুম সইতে হয়। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালির প্রধানতম মুখপাত্র। আর তাই তাঁরই নেতৃত্বে চলে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। যার সফল সমাপ্তি ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে।

স্বাধীন দেশের পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েই বঙ্গবন্ধু তাঁর সারা জীবনের বৈষম্যবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল-ভাবনাকে অর্থনৈতিক কৌশলে প্রতিফলন ঘটাতে ভুল করেননি। তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনাসমূহের যথার্থ প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই তাঁরই নেতৃত্বে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এবং বিভিন্ন ভাষণে। তাঁর লেখা তিনটি বই[১] পড়লেই অনুভব করা যায় আর্থসামাজিক রূপান্তর নিয়ে তাঁর আজীবনের স্বপ্ন-সাধ। সেই বাল্যকাল থেকেই তিনি মানুষের দুঃখ ও বঞ্চনার কথা ভাবতেন। সম্প্রতি প্রকাশিত গোয়েন্দা প্রতিবেদনগুলো[২] পড়লেও বোঝা যায় সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি কেমন অর্থনৈতিক কৌশল গ্রহণের পক্ষে ছিলেন। তিনি বরাবরই জনগণের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। মাটি-ঘেঁষা এই রাজনীতিক নিরন্তর চারপাশের

---

* ড. আতিউর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বঙ্গবন্ধু চেয়ার এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সম্মানসূচক প্রফেসর। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান এবং বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সমন্বয় এর নির্বাহী চেয়ারম্যান। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর। এ পদে থাকাকালে তিনি ফিনান্সিয়াল সেক্টরে অন্তর্ভুক্তিমূলক, ডিজিটাল এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকল্পে বহু সংস্কার সাধন করেছেন। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা ও আর্থিক খাতের বহুমাত্রিক সংস্কারে তিনি একজন নীতিনির্ধারক কর্মী হিসেবে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। দেশি-বিদেশি প্রকাশনা সংস্থা থেকে ইংরেজি ও বাংলায় তাঁর ৭০টিরও বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জার্নালেও তাঁর প্রচুর গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সহজ করে অর্থনীতি ও সমাজ নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নীতি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ নিয়মিত লিখে থাকেন।

দুঃখী মানুষের দুঃখে সমব্যথী হতেন এবং সেই দুঃখ মোচনের পথ খুঁজতেন। আর তাই স্বাধীন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য যেমন অর্থনৈতিক কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল ঠিক তেমটিই তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই কৌশল বাইরে থেকে ধার করা কোনো ভাবনা থেকে উত্থিত ছিল না। এ ছিল তাঁর অভিজ্ঞতাজাত মাটি ও মানুষের রূপকল্প[৩]।

তার মানে এই নয় যে তিনি বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং এর উল্টোটাই তিনি বিশ্বাস করতেন। এর পরিচয় মেলে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন এবং জাতিসংঘের সাধারণ সভায় তাঁর আমূল-সংস্কারবাদী ভাষণে। বিশেষ করে, ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে[৪] তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বিশ্বনেতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁদের সামনে তখন এমন একটি ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ ছিল, যেখানে কেবল নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর রাষ্ট্রগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করাই যথেষ্ট ছিলনা, পাশাপাশি সব দেশের সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণ করে এমন আন্তর্জাতিক কাঠামোও দরকারি। ঐ ভাষণে তিনি মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে, ঐ ঘোষণায় প্রতিটি মানুষের মুক্তভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিতে হবে সকলকেই। এবং তা করার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের নিজের ও তার পরিবারের কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করার সুযোগ তৈরি হবে। দেশজ ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তিনি সাধারণ মানুষের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর অর্থনৈতিক দর্শনে মানুষই ছিল একেবারে কেন্দ্রে। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন[৫]–'আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণ ভরে হাসুক।' (৯ মে ১৯৭২-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ)।

---

[১] *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, নবম সংস্করণ, ইউপিএল ২০১৯; *কারাগারের রোজনামচা*, বাংলা একাডেমি, ২০১৭; এবং *আমার দেখা নয়াচীন*, বাংলা একাডেমি, ২০২০।

[২] শেখ হাসিনা সম্পাদিত, *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০।

[৩] ৭ জুন ১৯৭২-এ এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,'আমি বিশ্বের কাছ থেকে সমাজতন্ত্র ধার করতে চাই না। বাংলার মাটিতে এই সমাজতন্ত্র হবে বাংলাদেশের মানুষের। এই সমাজতন্ত্র হবে বাংলার মানুষের যেখানে কোন শোষণ এবং সম্পদের বৈষম্য থাকবে না। ধনীকে আমি আর ধনী হতে দিব না। কৃষকেরা, শ্রমিকেরা এবং জ্ঞানীরা হবে এই সমাজতন্ত্রের সুবিধাভোগী।' [ড. এ এইচ খান সম্পাদিত *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা ২৬৪ থেকে, প্রকাশক একাত্তর প্রকাশনী, ২০১১]

[৪] ড. এ এইচ খান সম্পাদিত *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের পৃষ্ঠা ১১২ থেকে। প্রকাশক একাত্তর প্রকাশনী, ২০১১।

[৫] ড. এ এইচ খান সম্পাদিত *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা ২৪৭ থেকে। প্রকাশক একাত্তর প্রকাশনী, ২০১১।

বঙ্গবন্ধুর সাধারণের কল্যাণধর্মী এই অর্থনৈতিক দর্শন ধীরে ধীরেই গড়ে উঠেছে। একেবারে বাল্যকালেই তিনি অভুক্ত গরিব-দুঃখী মানুষের আহার জোগানোর জন্য পারিবারিক ভান্ডার থেকে ধান বিতরণের জন্য বাবার ওপর চাপ সৃষ্টি করতেন। আরেকটু বড়ো হয়ে তিনি গৃহশিক্ষক জনাব আব্দুল হামিদের নেতৃত্বে 'মুসলিম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তুলেছিলেন। উদ্দেশ্য–গরিব ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে ছুটির দিনে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আশপাশের গ্রাম থেকে 'মুষ্টি চাল' সংগ্রহ করা[৬]। তাছাড়া ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময়ই তিনি কলকাতায় ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হন। আর চারপাশের বুভুক্ষু মানুষের দুর্গতি দেখে তাঁর মন একেবারে ভেঙে যায়। তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে এই কষ্টের কথা স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। 'কোলকাতায় মৃত মায়ের বুক চেটে বেঁচে থাকার চেষ্ট কারা শিশু'র কথা তিনি লিখেছেন, ডাস্টবিনের খাবার নিয়ে কুকুর ও মানুষের টানাটানির দুর্বিষহ দৃশ্যের কথাও তুলে ধরেছেন[৭]। বাঙালির এই বিপর্যয়ের পেছনে যে ইংরেজের যুদ্ধনীতিই দায়ী ছিল সে কথা লিখতে তিনি ভুল করেননি। তিনি দেখেছিলেন যে, ট্রেনে যুদ্ধের সরঞ্জাম ও সৈনিক পারাপার করা হচ্ছিল বলেই খাবার সরবরাহ সীমিত হয়ে পড়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনকেই তাই বাংলার অধঃপতনের জন্য দায়ী করেছেন। তাই লিখেছেন, "ইংরেজরা বাংলা দখল করার আগে মুর্শিদাবাদের একজন ব্যবসায়ীর কাছে যে অর্থ ছিল সে অর্থ দিয়ে 'বিলাত শহর' কেনা যেত[৮]।" সে রকম একটি সোনালি অতীতের কথা সর্বদাই তাঁর মনে ছিল। অনুপম সেনের পিএইচডি থিসিস (যা পরে রাউটলেজ থেকে *দি স্টেট, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড ক্লাস ফরমেশন ইন ইন্ডিয়া* শিরোনামে প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে) থেকেও আমরা দেখতে পাই, বাংলাই ছিল উপমহাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, জনমানুষের পক্ষে রাজনীতি করে বাংলাদেশের সেই অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর স্বাধীন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েই সেই 'সোনার বাংলা' অর্জনে তিনি নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করেন। এই 'শ্মশান বাংলাকে সোনার বাংলা'য় রূপান্তর করার জন্য তাঁর যে নিরন্তর সংগ্রাম তা এক কথায় অনন্য। একদিকে কোটিখানেক শরণার্থীর পুনর্বাসন, দেশের ভেতরে লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া পরিবারের জীবন-জীবিকার সুযোগ করে দেওয়া এবং অন্যদিকে, নতুন দেশের জন্য সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কাজে তিনি দিনরাত পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর স্বপ্নের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার রূপরেখার ভিত্তিভূমি স্থাপন করে দেয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। তাঁর অর্থনৈতিক দর্শনের সন্ধান মেলে এই অসাধারণ দলিলে। তাতে স্থান পেয়েছে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা। এই রাষ্ট্রচিন্তায় চারটি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে–

- জাতীয়তাবাদ– বাঙালির নিজস্ব জাতীয় পরিচয় ও আত্মসম্মানের নিশ্চয়তা।

[৬] শেখ মুজিবুর রহমান রচিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৯ থেকে। সপ্তম মুদ্রণ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৯।

[৭] আগের তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৮ থেকে।

[৮] আগের তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৮ থেকে।

- সমাজতন্ত্র– নিজস্ব বাস্তবতাকে সামনে রেখে সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠন।
- গণতন্ত্র– জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সংসদীয় পদ্ধতির শাসন।
- ধর্মনিরপেক্ষতা– সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা।

সংবিধানের এই উদারনৈতিক, আধুনিক এবং জনহিতৈষী 'ভিশন'-এর আলোকেই বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্যোগ নেন। সেই উদ্যোগের রূপরেখা খুঁজে পাই আমরা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। ঐ দলিলের মুখবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে, সুসমন্বিত নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য অগ্রাধিকার ঠিক করা অপরিহার্য। সরকারকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্যই এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনগণের পূর্ণ অঙ্গীকার তিনি দেশ-গঠনের জন্য প্রত্যাশা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় জনগণ যে সাহস ও প্রাণশক্তি দেখিয়েছেন সেভাবেই তারা দেশ গড়ার কাজেও আত্মনিয়োগ করবেন– এমনটিই ছিল তাঁর বিশ্বাস[৯]। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। তাই উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা অপরিহার্য। স্বাধীন বাংলাদেশের উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার জন্য সুদূরপ্রসারী নীতি-ভাবনা পাওয়ার আশায় কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। ঐ কমিশন তাঁর জীবদ্দশাতেই একটি সুলিখিত প্রতিবেদন দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই কমিশন অত্যন্ত আধুনিক ও গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের প্রস্তাব করেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য এই কমিশনের দেয়া 'সোনার মানুষ' তৈরি করার সেই প্রস্তাবনাসমূহ তিনি বাস্তবায়নে হাত দেওয়ার আগেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। সংবিধান, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং শিক্ষা কমিশনে স্থান পাওয়া আর্থসামাজিক নীতি-ভাবনায় বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের লালিত স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটেছিল। আর শুরুতেই যেমনটি বলেছি, তাঁর এই স্বপ্নের মূলে ছিল বৈষম্যহীন এক সুষম বাংলাদেশ গড়ার অভিপ্রায়।

এও আমরা জেনেছি যে এই অভিপ্রায় তাঁর একদিনেই তৈরি হয়নি। একেবারে ছোটোবেলা থেকে ধীরে ধীরে তাঁর মানসপটে বেড়ে উঠেছে এই স্বপ্ন। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে বাঙালি এবং বিশ্বনাগরিক। তাই তিনি বাঙালি এবং সারা বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে সদাই সোচ্চার ছিলেন। অসমাপ্ত আত্মজীবনীর শুরুতেই তাঁর ডায়ারির একটি পাতায় ইংরেজিতে লেখা কিছু শব্দগুচ্ছ ঠাঁই পেয়েছে। এই শব্দগুচ্ছের বাংলা অনুবাদ যুক্ত করা হয়েছে বইটিতে। তাতে লেখা আছে[১০], 'একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।' এই উদ্ধৃতি থেকেই অনুভব করা যায়, বঙ্গবন্ধুর মনোজগৎ কতটা মানবিক ও বিস্তৃত। জীবন থেকেই তিনি শিখেছেন। মাটিঘেঁষা রাজনীতিই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড়ো

[৯] প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
[১০] শেখ মুজিবুর রহমান রচিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ থেকে। ২০১৯ সালে গ্রন্থটির সপ্তম মুদ্রণ প্রকাশ করেছে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

পাঠ্যক্রম। আর এই জীবন-ঘনিষ্ঠ রাজনীতিই তাঁকে গণমানুষের ভাগ্যোন্নয়নের অর্থনৈতিক নীতিকৌশল গ্রহণে উজ্জীবিত করেছে।

মূলত পূর্ব বাংলার কৃষক-প্রজা তথা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির আশাতেই তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। জমিদারি প্রথা বিনা ক্ষতিপূরণে বিলুপ্ত হবে, প্রজারা জমির মালিক হবেন, তাদের সন্তানেরা লেখাপড়া করে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে, গরিব মানুষের খাদ্যসংকট দূর হবে– এমন স্বপ্ন বুকে নিয়েই তিনি তদানীন্তন সিলেটের করিমগঞ্জ গিয়েছিলেন পাকিস্তানের পক্ষে গণভোট করার জন্য। কিন্তু দেশভাগের আগে-পরে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তিনি দেখলেন, তাতে তাঁর মন ভেঙে গেল। তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে তিনি দাঙ্গার শিকার অসহায় মানুষের জন্য ত্রাণশিবির পরিচালনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সুদূর পাটনা পর্যন্ত গিয়েছিলেন এ কাজে। তাই তাঁর ঢাকায় পৌঁছুতে বেশ খানিকটা দেরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে যে পাকিস্তান দেখলেন তা তাঁর কাছে এক 'ভ্রান্ত প্রত্যূষ' মনে হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক, ভূস্বামীনির্ভর, আমলানির্ভর যে অনুদার পাকিস্তান সরকার তিনি দেখলেন, তাতেই তিনি ও তাঁর সহযোগীরা হতাশ হয়ে পড়লেন। তাই খুব দ্রুতই তরুণ ও ছাত্রদের নিয়ে প্রথমে গণতান্ত্রিক যুবলীগ এবং পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সংগঠিত করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হলেন। একই সঙ্গে ছাত্ররাজনীতি চাঙ্গা করতে শুরু করলেন। এরই মধ্যে শুরু হয়ে যায় ভাষা আন্দোলন। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়েই তিনি ১১ই মার্চ ১৯৪৮ তারিখে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক বিচারে আটক হলেন। মাত্র কয়েকদিন জেলে ছিলেন। জেল থেকে বের হয়েই ফের ভাষা আন্দোলনকে আরো জোরদার করলেন। একই সঙ্গে তিনি মূলধারার রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হলেন। সেজন্য বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে ছাত্রলীগ সংগঠিত করতে শুরু করলেন। জড়িয়ে পড়লেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির আন্দোলনে। সে জন্য তিনি আবার বন্দি হলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হলেন। মুচলেকা দিয়ে ছাত্রত্ব বজায় রাখতে পারতেন। কিন্তু সে পথে গেলেন না।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে সংগঠিত করা শুরু করলেন। আবার জেলে গেলেন। জেলে থাকতেই ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। বন্দি অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সমন্বয় করে ভাষা আন্দোলনকে সক্রিয় রাখলেন। দ্রুতই তাঁকে ফরিদপুর জেলে পাঠানো হলো, সেখানেই তিনি পরিকল্পনামতো বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য মহিউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে আমরণ অনশন শুরু করলেন। এর মধ্যেই একুশের রক্তাক্ত ঘটনা ঘটে গেল। তিনি তারও এক সপ্তাহ পরে ছাড়া পান। অনশনে দুর্বল। তবু দ্রুতই ফিরে আসেন মূলধারার রাজনীতিতে। শুরু করেন কৃষক-শ্রমিক-ছাত্রদের সংগঠিত করে বিরোধী আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের কাজ। দলীয় সভায় বারবার বলতে থাকেন বঞ্চিত জনগণের দুঃখের কথা। দাবি তুলতে থাকেন বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের। লেগে থাকেন কৃষকদের পক্ষে আন্দোলন চাঙ্গা রাখার সাংগঠনিক তৎপরতায়। এরই মধ্যে যান চীন সফরে। সেখানেও তিনি চোখ-কান খোলা রাখেন চীনের কৃষি, শিল্প ও সমাজে অভাবনীয় পরিবর্তনের

দিকে। আর তাই *আমার দেখা নয়াচীন* বইতে লিখতে পেরেছিলেন[১১], 'নয়া চীন থেকে ঘুরে এসে আমার এই মনে হয়েছে যে, জাতির আমূল পরিবর্তন না হলে দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করা কষ্টকর। নতুন করে সবকিছু ঢেলে সাজাতে হবে।...সত্যি কথা বলতে কি– নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন তাদের ব্যবহার। মনে হয় সকল কিছুর মধ্যেই তাদের নতুনত্ব।'

তখনো তিনি নবীন রাজনীতিক। অথচ তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন চীনের কৃষি, শিল্প, শিক্ষাসহ অর্থনীতি ও সমাজের নানা প্রতিষ্ঠানে। জানতে চেয়েছেন কী করে এমন বিপুল সংস্কার সম্ভব হলো। মনে মনে ঠিক করেছেন দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে তিনিও এমন করে গণমানুষের জন্য কাজ করবেন। চীনে গিয়েও তিনি বাঙালিদের সঙ্গে পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণের কথা মনে করেছেন। মূলত পাকিস্তানের বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য কী করে মোকাবিলা করা যায়, সেটিই ছিল তাঁর রাজনৈতিক-অর্থনীতির মূল দর্শন। আর তাই 'দুই অর্থনীতি'র তত্ত্বকে সামনে আনতে থাকেন বঙ্গবন্ধু। সম্প্রতি প্রকাশিত 'গোয়েন্দা প্রতিবেদন'গুলো পড়লেই বোঝা যায়, তিনি সর্বক্ষণ এই বৈষম্যের নানা দিক নিয়ে কথা বলেছেন। মূলত ১৯৫৪ সালের যে নির্বাচন তিনি যুক্তফ্রন্টের পতাকাতলে করেছেন তাতেও দুই অঞ্চলের বৈষম্য দূর করার দাবি উঠে এসেছিল তীব্রভাবে। নির্বাচনি ইশতেহারের একুশ দফায় আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাড়াও বাংলা ভাষার মর্যাদার বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছিল। ঐ নির্বাচনে জিতে তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সরকার পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রে বেশি দিন টিকতে পারেনি। এরপর তাঁকে জেলে যেতে হয়। মুক্ত হয়েই দল গোছাতে সারা দেশ চষে বেড়ান দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। বৈষম্যের অর্থনীতি নিয়ে তাঁর কথা বলা চলতে থাকে। ফের তিনি প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হন। দুবার মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে তিনি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারলেন, বাঙালিদের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিসহ সব ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হচ্ছিল। তাই তিনি এ প্রশ্নে আরো সোচ্চার হয়েছিলেন। এরপর এলো আইয়ুব খানের সামরিক শাসন। আবারও তিনি জেলে গেলেন। দুই বছরেরও বেশি সময় জেলে থেকে তিনি কৌশল আঁটেন, কী করে স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সামনে আনা যায়। তদ্দিনে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদরাও দুই অর্থনীতির প্রশ্নে লিখতে ও বলতে শুরু করেছেন। জনগণ ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সচেতন হতে শুরু করেছেন। সে সময় অর্থনৈতিক বৈষম্যের ধরন ছিল খুবই তীব্র। অধ্যাপক নুরুল ইসলামের গবেষণায় ধরা পড়েছে এই বৈষম্যের চিত্র[১২]–

১. ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু সরকারি উন্নয়ন ব্যয় ছিল ৩.৫ থেকে ৫ গুণ বেশি। ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৯-৭০ সালে তা ছিল ২.২ থেকে ২.৬ গুণ বেশি। এদিকে ১৯৬৪-৬৫ সালে মোট উন্নয়নমূলক সরকারি ব্যয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল মাত্র ৩১ শতাংশ।

---

[১১] শেখ মুজিবুর রহমান রচিত *আমার দেখা নয় চীন* গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১০৭ থেকে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত, ২০২০।

[১২] নুরুল ইসলাম রচিত *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : কাছে থেকে দেখা* গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৬-১৭। প্রথমা প্রকাশন, ২০২০।

২. বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের নিয়ন্ত্রকও ছিল কেন্দ্রীয় সরকার। শিল্প বিনিয়োগের লাইসেন্স ও বৈদেশিক মুদ্রা বণ্টনের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগে ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল মাত্র ১৩ শতাংশ এবং ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তা ২০ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। ১৯৬০-এর দশকের শেষে এই বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মাত্রা দাঁড়ায় ২৫ শতাংশে।

৩. সরকারি ও বেসরকারি কোনো খাতেই পূর্ব পাকিস্তান ঐ দুই দশকে ৩৬ শতাংশের বেশি বিনিয়োগের সুযোগ পায়নি।

৪. ফলাফলে দেখা গেছে, পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে ১৯৪০-৫০ সালে ১৭ শতাংশ, ১৯৫৯-৬০ সালে ৩২ শতাংশ এবং ১৯৬৯-৭০ সালে ৬১ শতাংশ বেশি ছিল।

বৈষম্যের এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু উপস্থাপন করেন ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবি। ঐতিহাসিক ৬-দফার মধ্যে একটি ছিল ফেডারেল স্টেট অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সরকার গঠিত হবে। প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতায়ন করা হবে। অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। কর আহরণে প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে। প্রাদেশিক সরকার যতটুকু অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেবে সেটা দিয়েই তাকে চলতে হবে। প্রদেশের আলাদা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা থাকবে। দুই প্রদেশের আলাদা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্ভব না হলেও তারা আলাদাভাবে পরিচালিত হবে। প্রদেশের নিজস্ব মিলিশিয়া অথবা প্যারামিলিটারি বাহিনী থাকবে। আরো পরে ১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবরে দেওয়া তাঁর প্রাক-নির্বাচনি বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে তার অর্থনৈতিক দর্শনের পেছনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে[১৩], 'যে সংকট আজ জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে তার প্রথম কারণ দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয় কারণ জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত। তৃতীয় কারণ অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের জন্যে সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে। এগুলোই বাঙালির ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ।'

তিনি এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন যে পূর্ব বাংলার মানুষ কেন এতটা বঞ্চিত। সেই বঞ্চনার অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ব্যালটে হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্র বাঙালির এই জয় মানতে পারেনি। কাজেই রাজনৈতিক সংগ্রামকে সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরের কোনো বিকল্প ছিল না বঙ্গবন্ধুর কাছে। বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধে তাই অভাবনীয় নেতৃত্ব দেন। শারীরিকভাবে উপস্থিত না থেকেও তাঁর নৈতিক উপস্থিতি ছিল সর্বত্র। অবশেষে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। শ্মশান বাংলা থেকে সোনার বাংলা গড়বার যে অভিযাত্রা শুরু করেছিলেন সেখানেই আমরা খুঁজে পাব বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের অনেকটাই। বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছিলেন সে স্বাধীনতার রূপটা কেমন তাঁর কন্যা

---

[১৩] ড. এ এইচ খান সম্পাদিত *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা ২১৩ থেকে। প্রকাশক একাত্তর প্রকাশনী, ২০০৯।

[১৪] শেখ হাসিনা ও বেবী মওদুদ সম্পাদিত *বাংলা আমার আমি বাংলার* গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৫১ থেকে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯৮

শেখ হাসিনা ও বেবী মওদুদ সম্পাদিত *বাংলা আমার, আমি বাংলার* গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠাতে আছে[১৪]–"এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলাদেশের কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।...আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আরো শক্তিশালী শত্রু। এই শত্রু হলো অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা, বেকারি ও দুর্নীতি।...এই যুদ্ধে জয় সহজ নয়। অবিরাম এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং একটি সুখী, সুন্দর, অভাবমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। তবেই হবে আমাদের সংগ্রাম সফল। আপনাদের শেখ মুজিবের স্বপ্ন ও সাধনার সমাপ্তি।'

ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি দেশকে দাঁড় করানো মোটেও সহজ ছিল না। মনে রাখতে হবে সে সময়ে আমাদের অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র ৮ বিলিয়ন ডলার। আমাদের সঞ্চয়-জিডিপির হার ছিল ৩ শতাংশ। আমাদের রিজার্ভ ছিল শূন্য। বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ৯ শতাংশ। এমন শূন্য হাতে তিনি রওনা হয়েছিলেন সোনার বাংলা গড়ার জন্য। তাঁকে যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছে একেবারে গোড়া থেকে। ১ কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন করতে হয়েছে। দেশের ভেতরে বাস্তুচ্যুত ২০ লক্ষ মানুষের ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য তৈরি করতে হয়েছে জনবান্ধব গণতান্ত্রিক সংবিধান। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে শুরু করে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে ঢেলে সাজাতে হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়েছে। এমন সংকটকালেও তিনি আগামীর উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করেছেন। শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন গঠন করেছেন। এসবই করতে হয়েছে প্রতিকূল পরিস্থিতি ও বিরূপ আন্তর্জাতিক পরিবেশ মোকাবেলা করে[১৫]।

এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই তিনি শিল্পকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আনতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাকিস্তানি উদ্যোক্তারা তাদের শিল্পকারখানা ফেলে চলে গিয়েছিলেন। আমাদের দেশেও উদ্যোক্তা শ্রেণির বিকাশ ঘটেনি। আর বৈষম্য দূর করার সামাজিক চাপ প্রবল। তাই খুবই সুচিন্তিতভাবে পরিকল্পনা করে তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করেছিলেন। কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন, উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসনই ছিল তাঁর সে সময়ের অর্থনৈতিক মূল কৌশল। এর পাশাপাশি তাঁর লক্ষ্য ছিল ব্যাপক ঘাটতি অর্থনীতি সত্ত্বেও বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা। আমদানি-নির্ভরতা কমিয়ে স্বদেশি শিল্প উৎপাদন বাড়ানোর ওপর তাই তিনি খুব জোর দিয়েছিলেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২৫ বিঘার নিচে মালিকানাসম্পন্ন কৃষকদের খাজনা মওকুফ, সার-বীজ-সেচ প্রদানে ভর্তুকি এবং কৃষি ঋণ বিতরণে কৃষি ব্যাংক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোকে তিনি সক্রিয় করেছিলেন। কৃষকদের বিরুদ্ধে করা ১ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করে নেন। শহরে ও গ্রামে ন্যূনতম মূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্য রেশন-ব্যবস্থাও চালু করেছিলেন।

---

[১৫] নুরুল ইসলাম রচিত *বাংলাদেশ জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা* গ্রন্থ থেকে। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৮।

যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির প্রাথমিক পুনর্বাসন শেষ করেই তিনি প্রশাসনের বিকেন্দ্রায়ন, মালিকানা ঠিক রেখেই গ্রামীণ সমবায় ব্যবস্থা, এবং দুর্নীতি দূর করার লক্ষ্য সামনে রেখে দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। শিল্পক্ষেত্রেও তিনি ধীরে ধীরে বিনিয়োগ সীমা ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি টাকায় উন্নীত করেছিলেন। বাস্তববাদী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতি সামনের দিকেই হাঁটছিল। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল ৯৩ ডলার। ১৯৭৫ সালে তা ২৭৩ ডলারে উন্নীত হয়েছিল। অথচ ১৯৭৬ সালেই বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশে তা ১৩৮ ডলারে নেমে গিয়েছিল। তার পরের বছর তা আরো কমে ১২৮ ডলারে পৌঁছেছিল।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈরী আন্তর্জাতিক কূটনীতি, তীব্র খাদ্যঘাটতি, স্বাধীনতা বিরোধীদের অন্তর্ঘাত, অসহিষ্ণু তরুণদের বিক্ষোভ– এসব মোকাবিলা করেই তিনি ধীরে ধীরে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আরেকটু সময় পেলেই স্বদেশ তাঁর সুদূরপ্রসারী সংস্কারের সুফল পেত। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে সে সুযোগ দিল না। বাংলাদেশ ফের যাত্রা শুরু করেছিল অন্ধকারের দিকে। স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে শুয়ে আছেন যে জন তাঁকে অবজ্ঞা করে বাংলাদেশের মৌলচেতনাকে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিল তারা।

অনেক ত্যাগ, রক্ত ও সংগ্রাম শেষে স্বদেশ ফিরেছে মুক্তিযুদ্ধের পথে, বঙ্গবন্ধুরই সুযোগ্য কন্যার হাত ধরে। অনেক চড়াই-উতরাই সত্ত্বেও বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার পথে। চলমান করোনা সংকট কালেও বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক দেশের চেয়ে ভালো করছে। তবে চ্যালেঞ্জ তো আছেই। অদৃশ্য ভাইরাসকে মোকাবিলা করেই সামনের দিকে হাঁটছে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর প্রোথিত লড়াকু মন নিয়েই তাঁর প্রিয় বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে সমৃদ্ধির পথে। উন্নয়নের এই অভিযাত্রা সচল থাকুক। আমরা পারি, আমরা পারব– এই আশাবাদ বজায় থাকুক সর্বত্র। সর্বক্ষণ।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন : বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা

ড. খন্দকার বজলুল হক *

ভূমিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, মহান স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আপাদমস্তক রাজনীতিক ছিলেন। সারা পৃথিবীতে তিনি রাজনীতিবিদ হিসেবেই পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রখ্যাত মার্কিন সাময়িকী 'নিউজউইক' তাকে নিয়ে প্রচ্ছদ করে এবং বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি (Poet of Politics) হিসেবে আখ্যায়িত করেন[১]। এ কথা অনস্বীকার্য বঙ্গবন্ধুর মূল পরিচয় রাজনীতিবিদ। কিন্তু তিনি কার্যত বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী ছিলেন। আক্ষরিক অর্থে তিনি কোনো বিদগ্ধ অর্থনীতিবিদ না হলেও প্রায়োগিক অর্থে তিনি একজন বড়ো মাপের অর্থনীতিবিদ ছিলেন। অর্থনীতির দুটি মূল ধারা তথা– পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো তাঁর রাজনীতির মূল উপজীব্য ছিল অর্থনীতি এবং তিনি কখনো অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে রাজনীতিকে দেখেননি। বলা বাহুল্য, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সাধারণ মানুষের জীবনমান। তাঁর রাজনীতির প্রেরণা এসেছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণ কামনা থেকে, তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের চিন্তা-চেতনা থেকে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশের। তিনি প্রায়শ বলতেন, 'বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আমি রাজনীতি করি[২]।'

বঙ্গবন্ধু পুঁজিবাদবিরোধী ছিলেন। সমাজতন্ত্রে তার আস্থা ছিল, তবে তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না। তিনি সাম্যবাদী ছিলেন এবং গরিব মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু সব সময় বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। এক কথায়, 'উন্নয়ন' কথাটির মর্মবাণী কী, সে সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর একটি নিজস্ব ভাবনা ছিল এবং তিনি একটি দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নকে বঙ্গবন্ধু তাঁর এই উন্নয়ন দর্শনের আলোকে দেখেছেন এবং এই শিল্পের উন্নয়নকে তিনি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বিকাশের অন্যতম বাহন হিসেবে বিবেচনা করতেন। আর তাই তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই এই শিল্পের উন্নয়নে কাজ করেছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা ও তাঁর সময়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করব। প্রসঙ্গত, আমরা বর্তমান

* ড. খন্দকার বজলুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বিভাগের সম্মানসূচক অধ্যাপক। ড. হক কর্মজীবন শুরু করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের লেকচারার হিসেবে। তিনি ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল ইকোনমি, মস্কো, রাশিয়া থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে প্রফেসর হক ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান এবং বিজনেস ফ্যাকাল্টির ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন সিনিয়র ফুলব্রাইট ফেলো এবং বর্তমানে আওয়ামী লীগের এডভাইজরি কাউন্সিলের একজন সদস্য।

সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই শিল্পের গুরুত্ব, সম্ভাবনা ও সমস্যা এবং সমস্যা উত্তরণে আমাদের করণীয় নিয়েও আলোচনা করব। গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে এ বিষয়ের ওপর এযাবৎকালে প্রকাশিত (দেশে ও বিদেশে) বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, সরকারের বিভিন্ন প্রকাশনা এবং সর্বোপরি বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত নানা পদক্ষেপ এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁর দেওয়া নানা বক্তব্য ও মন্তব্যকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করব।

দুই. বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন

বঙ্গবন্ধু কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন? বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনটি কী ছিল? ঐ দর্শনের মর্মবস্তু কী? এসব প্রশ্নের উত্তর কিছুটা আমরা পাই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারকাতের *বঙ্গবন্ধু-সমতা-সামাজ্যবাদ* গ্রন্থে। তাঁর মতে, 'বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন তাঁরই উদ্ভাবিত দেশের মাটি থেকে উত্থিত অথবা স্বদেশজাত উন্নয়নদর্শনের ভিত্তিতে এমন এক বাংলাদেশ বির্নিমাণ করতে যে বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা; যে বাংলাদেশে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি হবে চিরস্থায়ী; যে বাংলাদেশ হবে চিরতরে ক্ষুধামুক্ত – শোষণমুক্ত; যে বাংলাদেশে মানব মুক্তি (liberty অর্থে) নিশ্চিত হবে; যে বাংলাদেশে নিশ্চিত হবে মানুষের সুযোগের সমতা; যে বাংলাদেশ হবে বঞ্চনামুক্ত-শোষণহীন-বৈষম্যহীন-সমতাভিত্তিক-অসাম্প্রদায়িক দেশ[৫]।' বঙ্গবন্ধুর প্রগতি-দর্শনের অন্যতম সুস্পষ্ট প্রতিফলন হয়েছে ১৯৭২-এর সংবিধানের প্রস্তাবনায়; যেখানে বলা হয়েছে, 'আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা– যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে[৬]।'

বস্তুত, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-প্রগতি দর্শন গণমানুষের স্বার্থ, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামেরই ফসল। আমরা যদি পেছনে ফিরে তাকাই, তাহলে দেখব বঙ্গবন্ধুর সকল রাজনৈতিক কর্মসূচির একটি অর্থনৈতিক দিক আছে এবং সেটি গণমানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছিল। 'আমাদের বাঁচার দাবী' খ্যাত বঙ্গবন্ধুর ১৯৬৬ সালের ৬-দফা মূলত একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচি।

পাকিস্তানের দুটি অংশ– পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের পটভূমিতে বঙ্গবন্ধু ৬-দফা রচনা করেছিলেন এবং বলা বাহুল্য, ৬-দফা মূলত অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছিল। এই কর্মসূচিতে পাকিস্তানের দুটি অঞ্চলকে যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ ছিল, 'কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি ছাড়া আর সবকিছুর দায়িত্ব প্রদেশের উপর বর্তাবে। চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে আর্থিক বৈষম্যের অবসান[৭]।'

৬-দফা প্রচারকালে বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণ থেকেও এ কথা সুস্পষ্ট। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ বঙ্গবন্ধুর বয়ানে তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন, "ইহা দলের প্রয়োজনে প্রণীত রাজনৈতিক স্লোগান নয়, ৬-দফা কোন দল বিশেষের কর্মসূচি কিংবা ভোট লাভের কৌশল নয়। 'ইহা রূঢ় বাস্তবতার

প্রতিধ্বনি এবং আমাদের জীবন-মরণ প্রশ্ন', '৬-দফা বিনিময়যোগ্য বস্তু নয়', '৬-দফা রাজনৈতিক দর কষাকষির কোন ব্যাপার নহে', 'ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের জীবন-মরণ প্রশ্ন'[৬]।" ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনের মূল স্লোগান ছিল, 'সোনার-বাংলা শ্মশান কেন ?' যা সর্বাংশে অর্থনীতিকেন্দ্রিক।

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল সাম্য, মর্যাদা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের সংবিধানে গৃহীত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি তথা– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সেই আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, তবে তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধী ছিলেন না। বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না। তিনি মূলত সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান দেখতে চেয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে চীন সফর সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* লিখেছেন, 'আমি নিজে কম্যুনিষ্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না[৭]।' বঙ্গবন্ধু সারা জীবন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু তিনি শোষকের নয় শোষিতের গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মহীনতা নয় অসাম্প্রদায়িকতাকে বুঝিয়েছেন। তিনি চাইতেন পবিত্র ধর্মকে কেউ যেন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে।

দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধু অতি দ্রুততার সঙ্গে জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে জরুরিভাবে কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সংবিধান প্রণয়ন, জাতীয়করণ কর্মসূচি গ্রহণ, কৃষি সংস্কার, শিক্ষা কমিশন গঠন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গৃহীত নানা পদক্ষেপ। তিনি এ সবকিছুই করেছিলেন সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে।

জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১৫ সালে গৃহীত ২০৩০ এজেন্ডা বা 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহে'র তিনটি স্তম্ভ; স্তম্ভগুলো হচ্ছে (ক) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি (খ) সামাজিক ন্যায়বিচার এবং (গ) পরিবেশ রক্ষা। 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ' হচ্ছে একটি মানবিক সমাজ বিনির্মাণের সংকল্প, যেখানে উন্নয়ন হবে, কিন্তু সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি হবে না এবং পরিবেশের কোনো ক্ষতি করা যাবে না। আমরা যদি মানুষের কল্যাণ কামনায় বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখব, তিনি এ ধরনের একটি সমাজ এবং এমন একটি পৃথিবীর স্বপ্নই দেখতেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর সংকল্পের কথা আমরা কমবেশি অবহিত হলেও তিনি যে কতটা পরিবেশসচেতন ছিলেন সে কথা আমরা হয়তো অনেকেই জানি না। বঙ্গবন্ধু উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে কখনো মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাননি। তিনি বলতেন, আমাদের জীবনের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার চারটি– যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থের উৎস হচ্ছে প্রকৃতি। সুতরাং প্রকৃতির প্রতি আমরা যেন কখনো নিষ্ঠুর না হই– যদি হই, তাহলে তা হবে আত্মঘাতী। এক কথায়, বঙ্গবন্ধু একটি নিরাপদ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতেন যার

ভিত্তি ছিল ভালোবাসা– সব মানুষের প্রতি ভালোবাসা। তাই বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে এক পরম মানবতাবাদী উচ্চারণ যা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, 'একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালী হিসাবে যা কিছু বাঙালীদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালবাসা, অক্ষয় ভালবাসা, যে-ভালাবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে[৮]।'

২০২০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবিক প্রগতি' শীর্ষক উন্মুক্ত বক্তৃতায় নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন অর্থনীতি ও প্রগতির সঙ্গে যে যোগসূত্রতার কথা বলেন, তার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়নদর্শনের অনেকটাই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অর্মত্য সেন মনে করেন, 'শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয় একই সাথে মানবিক প্রগতিও জরুরি– যা সব সময় ঘটে না। যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানবিক প্রগতি যুক্ত না হয় তাহলে সাধারণ মানুষ উন্নয়নের কোন সুফল পায় না[৯]।' বঙ্গবন্ধুও তেমনই ভাবতেন। বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকে একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে দেখেননি। বঙ্গবন্ধু দেশের উন্নয়ন বলতে মুষ্টিমেয় মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনকে বোঝাননি। তিনি উন্নয়ন বলতে সব মানুষের, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়নকে বুঝিয়েছেন। তিনি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক মুক্তির কথা বলেছেন। আনন্দের কথা, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন আজ সে কথাই বলছেন।

তিন. বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পটভূমি ও বিকাশ : বঙ্গবন্ধুর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ইতিহাসে শিল্পবিপ্লবের সময় হিসেবে চিহ্নিত। প্রথমে ব্রিটেন এবং পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'শিল্পবিপ্লব' সংঘটিত হয়। শিল্পবিপ্লবের নানা পর্যায় রয়েছে। পৃথিবী এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব প্রত্যক্ষ করছে, যা মূলত কৃত্রিম বুদ্ধমত্তানির্ভর (AI)। উল্লেখ্য, পৃথিবীর সব দেশে শিল্পবিপ্লবের ঢেউ একই সময়ে এবং সমানভাবে লাগেনি। পৃথিবীতে এখনো এমন দেশ আছে, যেখানে চতুর্থ নয়, তৃতীয় শিল্পবিপ্লবও সেভাবে জায়গা করে নিতে পারেনি। বাংলাদেশ সেদিক থেকে ভাগ্যবান। শিল্পবিপ্লবের প্রত্যেকটি পর্যায়ের সঙ্গে বাংলাদেশের কমবেশি সংযোগ ঘটেছে, শিল্পবিপ্লবের ভালোমন্দ দুটোই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বাংলাদেশে এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলার জন্য নানামুখী প্রস্তুতি চলছে।

এতৎসত্ত্বেও বললে অত্যুক্তি হবে না, বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে কৃষিনির্ভর। দেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু শাসনভার গ্রহণের সময় শতকরা ৮৫ ভাগ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি ছিল কৃষি খাতনির্ভর[১০]। বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৫০ ভাগ এবং জাতীয় আয়ের শতকরা ২২ ভাগ আসে কৃষি খাত থেকে[১১]। উল্লেখ্য, বর্তমানে জাতীয় অর্থনীতিতে একক খাত হিসেবে কৃষির অবদান আপেক্ষিকভাবে কমলেও সামগ্রিক বিবেচনায় বাংলাদেশ এখনো কৃষিনির্ভর এবং কৃষিই দেশের অর্থনীতির ভিত্তি ও মূল শক্তি। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের এই অসামান্য ও কৌশলগত গুরুত্বের কারণ বহুবিধ, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রাম্য দারিদ্র্য বিমোচন

তথা পল্লি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ সব ধরনের শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং সর্বোপরি দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে এই খাতের অনবদ্য ভূমিকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বাংলাদেশ আজ যে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে তার ভিত্তিও রচনা করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত নানা সংস্কারমূলক কার্যক্রম, যেমন– স্বল্পমূল্যে/বিনা মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি কৃষিবিষয়ক উচ্চশিক্ষা ও কৃষি গবেষণা-প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ-জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'গ্রাম'। গ্রাম হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাণ। আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশের সমাজের ভিত্তি ছিল গ্রাম। নগরায়ণে সাম্প্রতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও গ্রামের এই গুরুত্ব অব্যাহত আছে। ঐতিহাসিকভাবে ভারত ও বাংলাদেশে গ্রামের স্বশাসনের ঐতিহ্য ছিল। বিগত দিনে, বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলে (জমিদারি প্রথা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে) নানা বিরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে গ্রামের এই প্রাতিষ্ঠানিক ও ঐতিহ্যপূর্ণ ভূমিকা আজ আর নেই। অন্যদিকে, ইদানীংকালে নগরায়ণের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবুও বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মূল অংশ এখনো গ্রামেই বসবাস করে।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ভাবনায় আর যে বিষয়টি আবহমানকাল থেকে প্রাসঙ্গিক, সেটি হলো সমবায় পদ্ধতি। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতির পিতা সমবায়ের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। এ দেশের পিছিয়ে থাকা মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পন্থা হিসেবে তিনি সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু সমবায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে সংবিধানে ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়কে গণমুখী আন্দোলন করার ডাক দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, দেশের জনগণের পুষ্টিচাহিদা পূরণে দরিদ্র, ভূমিহীন, নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে একটি 'দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন' প্রকল্প গ্রহণ করে পাঁচটি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপন করেন। আজকের 'মিল্কভিটা' তারই সুদূরপ্রসারী ফসল। জাতির পিতা সমবায় পদ্ধতির সমন্বিত/যৌথ খামার প্রচলনের মাধ্যমে উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় রাজস্বে পল্লি উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু সমবায়ী গ্রাম সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাবটি জনসমক্ষে তুলে ধরেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'আমি ঘোষণা করছি যে, পাঁচ বছরের প্লানে (পরিকল্পনায়) প্রত্যেকটি গ্রামে কম্পালসারী (বাধ্যতামূলক) কো-অপারেটিভ (সমবায়) হবে। বাংলাদেশে ৬৫ হাজার গ্রাম– কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেক মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে– তাকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। গ্রাম গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে[১২]।'

বঙ্গবন্ধুর দর্শন ছিল সমবায়ের ভিত্তিতে দেশের উন্নয়ন, অর্থাৎ সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করে শোষণহীন সুখী সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণ। এখনো বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথেই চলছে দেশের সমবায় কার্যক্রম। বর্তমানে দেশে ১ কোটি ৯০ লাখ ৫৩৪টি সমবায় সমিতি আছে এবং সমিতির সদস্য সংখ্য প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ। জাতীয় অর্থনীতিতে সমবায় কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, পোশাক, দুগ্ধ উৎপাদন, আবাসন, ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয়, কুটির-চামড়াজাত-মৃৎশিল্প ইত্যাদি খাতের বিকাশ; কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, এবং ক্ষুদ্র ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করতে বিশাল অবদান রাখছে। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের শিল্পায়ন বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের ভিত্তি বঙ্গবন্ধুই রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু ১৯৫৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৭ সালের ৩০ মে পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে তিনি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প আইন (১৯৫৭) প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করেন, যা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) নামে পরিচিত। ১৯৫৭ সালে ইপসিকের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে এবং তা পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ১ কোটি টাকার একটি মূলধন তহবিলও প্রদান করা হয়েছিল। ১৯৬০-এর দশকের গোড়াতে ঢাকার গুলিস্তানে স্থাপিত নাজ সিনেমা হল, *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রেস, রায়েরবাজারের বেঙ্গল সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ ইত্যাদি ইপসিকের অর্থায়নেই স্থাপিত হয়েছিল। ইসপিকের আওতায় রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে স্থাপিত দুটি বড়ো স্থাপনা– রাজশাহী সিল্ক ফ্যাক্টরি ও রায়েরবাজারস্থ বেঙ্গল সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইপসিক নতুন নামে (বিসিক) সারা দেশে তার কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করেছে, দেশে হাজার হাজার শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে বিসিকের মোট চারটি আঞ্চলিক কার্যালয়, ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৭৪টি শিল্পনগরী, ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র এবং তিনটি পার্বত্য জেলার ২২টি উপজেলায় ৩২টি উৎপাদন-কাম প্রশিক্ষণকেন্দ্র রয়েছে। দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচন তথা জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে বিসিক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। তাই আমরা যদি পেছনে ফিরে তাকাই তাহলে দেখি শুধু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প নয়, মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্প তথা দেশের শিল্পায়নের ভিত্তি বঙ্গবন্ধুর হাতেই রচিত হয়। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের রাষ্ট্রীয় খাতকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্পায়নের ভিত্তি সুদৃঢ় করার পাশাপাশি ব্যক্তি খাতের বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তাই ১৯৭৫-৭৬ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ড. এ আর মল্লিক উল্লেখ করেন যে, 'পুঁজি বিনিয়োগে বেসরকারি উদ্যোক্তাদিগকে যথাযথ ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এবং বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকল্পে, সরকার চলতি অর্থবছরের শুরুতে বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগের উর্দ্ধসীমা ২৫ লক্ষ হইতে ৩ কোটি টাকায় উন্নীত করেন এবং বেসরকারী খাতে কয়েকটি নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে[১৩]।'

চার. বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা : একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন

কোনো দেশের শিল্পায়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজিক বিকাশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিশেষ ভূমিকা ও অবদান আজ সারা পৃথিবীতে একটি স্বীকৃত বিষয়। উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত নির্বিশেষে পৃথিবীর সব দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। Ayyagari and others-এর মতে উন্নয়নের পর্যায়-নির্বিশেষে যে-কোনো দেশের উৎপাদনের শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ এবং শিল্প খাতে মোট কর্মসংস্থানের শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগ আসে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প থেকে[১৪]। এ প্রসঙ্গে যেটি উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হলো ভবিষ্যতে এই ধারা শুধু অব্যাহত নয় বরং আরো জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই অর্থনীতিতে যে কাঠামোগত রূপান্তর (structural transformation) লক্ষ করা যাচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সাম্প্রতিক কালে উন্নত বিশ্বের, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দা, আধুনিক শিল্পায়নে বৃহৎ শিল্পের ভূমিকাকে কিছুটা হলেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। Brich David সত্তরের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির দুঃসময়কে বৃহৎ শিল্পের ব্যর্থতা এবং সেই অবস্থা থেকে উত্তরণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সক্ষমতাকে সাফল্য হিসেবে দেখেছেন। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ওইসিডির সদস্য দেশগুলোসহ সারা বিশ্বে উত্তোরোত্তর আরো সক্রিয় হচ্ছে। এই সক্রিয়তার (resurgence) কারণ হিসেবে ওইসিডি জরিপে যেসব বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাসমূহ :

ক. উদ্যোক্তা সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে কাজ করা;
খ. উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা পালন করা;
গ. বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং সর্বোপরি
ঘ. দেশের অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় মূল্য সংযোজনের সক্ষমতা[১৫]।

উন্নত দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবস্থান যখন এতটা মজবুত তখন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা ও অবদান গুরুত্বপূর্ণ হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। স্মরণযোগ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শুধু একটি স্বতন্ত্র খাত নয়, অর্থনীতির অন্য সব খাতের সঙ্গেও এই শিল্প নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বলতে আমরা কী বুঝব সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা জরুরি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর নানা দেশে বৃহৎ শিল্পের সংজ্ঞায় যতটা পরিবর্তন আনা হয়েছে, বৃহৎ শিল্প নয় এমন সব শিল্পের সংজ্ঞায় তার চেয়ে বেশি পরিবর্তন আনা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশে অবৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (SCI), ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME),

কুটির মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (CMSME) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বৃহৎ শিল্প নয় এমন সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SMI) হিসেবে বিবেচনা করব। আরো উল্লেখ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SMI) এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে (SME) আমরা একই অর্থে ব্যবহার করব। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। সংখ্যা বিবেচনায় দেশের শতকরা ৯৯ ভাগের বেশি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেণির অন্তর্গত। [টেবিল ১ দ্রষ্টব্য]

টেবিল ১ : বাংলাদেশের ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি বিভাজন

শ্রেণি	সংখ্যা (মিলিয়ন)	শতকরা হার
কুটির	৬৮৪৩	৮৭.৫২
মাইক্রো	০.১০৪	১.৩৩
ক্ষুদ্র	০.৮৫৯	১০.৯৯
মাঝারি	০.০০৭	০.০৯
বৃহৎ	০.০০৫	০.০৭
মোট	**৭৮১৮**	**১০০**

সূত্র : বিবিএস, ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান শুমারি ২০১৩

উল্লেখ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি-ব্যবসায়ে নিয়োজিত মোট প্রতিষ্ঠানের শতকরা ১১.১ ভাগ সরাসরি কারখানা-শিল্পের সঙ্গে এবং বাকিরা সেবা খাতে জড়িত। শুধু সংখ্যার বিবেচনায় নয়, দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ এবং শিল্প খাতে মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৮০ ভাগ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (বিস্তৃত অর্থে) অবদান। কেবল অর্থনীতি নয়, সমাজ পরিবর্তনেও এই শিল্প খাত নানাভাবে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্রুততম বিকাশমান অর্থনীতির ১১টি দেশের অন্যতম একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান অপরিসীম। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের এই অভূতপূর্ব ভূমিকার পেছনে রয়েছে বড়ো মাপের দুটি কারণ। **প্রথমত**, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিশেষ সুবিধাসমূহ (যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি)। **দ্বিতীয়ত**, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতা। বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর, 'দারিদ্র্য বিমোচন' আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারীর ক্ষমতায়ন এখন বাংলাদেশে একটি বহুল আলোচিত রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি। তাছাড়া নদীভাঙন ইত্যাদি কারণে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর (migration) বাংলাদেশের জন্য একটি নিত্যদিনের ঘটনা। তাছাড়া বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী যারা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১.৮ শতাংশ এবং যারা শহরের জীবনে মোটেই আগ্রহী নয় তাদের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্ব, পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট এক ভয়াবহ সমস্যা মোকাবিলা করছে। এই সংকটের মূল কারণ বৃহৎ শিল্পের অপরিকল্পিত উন্নয়ন। পক্ষান্তরে, পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে

কেবল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। সর্বোপরি, ইদানীংকালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে স্লোগান উঠেছে, 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়, সবাইকে নিয়ে এবং সবার জন্য উন্নয়ন চাই' যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Inclusive Development' সেটি কার্যকর করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কোনো বিকল্প নেই।

পাঁচ. উপসংহার

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত এবং সমাদৃত। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে এই শিল্পটি দেশের অর্থনীতিতে তার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এসব প্রতিবন্ধকতা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং চিহ্নিত সমস্যাগুলো নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা- জরুরি প্রয়োজন।

ক্ষুদ্র পরিসরে পরিচালিত এই গবেষণা থেকে এই শিল্পের উন্নয়নের পথে আমরা যেসব প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করেছি তার অধিকাংশই মৌলিক ও সর্বজনীন। এসব সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পুঁজির অভাব, উন্নত প্রযুক্তির অভাব, প্রযুক্তি ব্যবহারের জ্ঞানের অভাব অথবা উন্নত বাজারজাতকরণ সমস্যা এবং আন্তর্জাতিকীকরণের সীমাবদ্ধতা। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য বাড়তি সমস্যাগুলোর মধ্যে আছে অবকাঠামোগত সমস্যা (বিশেষ করে জমি ও বিদ্যুতের উচ্চ মূল্য এবং পরিবহণ সমস্যা), উচ্চ আয়কর, আবগারি শুল্ক ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায়-নিয়ন্ত্রণে আইনি জটিলতা এবং পুনর্বাসন কর্মসূচির অভাব। সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে এই শিল্পকে সহায়তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই শিল্পের সহজাত বৈশিষ্ট্য যেমন সম্পদের অপ্রতুলতা, মালিকানার কাঠামোগত সমস্যা, বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার অক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিকীকরণের সীমাবদ্ধতা এই শিল্পকে সব সময় চাপের মধ্যে রাখে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সমস্যা হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে প্রকৃত উদ্যোক্তার (entrepreneurial driven) পাশাপাশি বেঁচে থাকার তাগিদ-তাড়িত (survival driven) উদ্যোক্তার সংখ্যাও অনেক। নীতিসহায়তার অভাব এই শিল্পের জন্য কতটা বিপজ্জনক সেটি পরিষ্কার হয়েছে করোনা মহামারিতে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রেরণা উদ্দীপক কর্মসূচির (stimulus package) টাকা পেতে ক্ষতিগ্রস্তদের হয়রানির কথা গণমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার পর।

আমাদের সুপারিশ হচ্ছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সর্বজনীন সমস্যাসহ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যাগুলো দ্রুততার সঙ্গে সমাধান করতে হবে। তাছাড়া সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের পাশাপাশি আরো দুটি বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে। **এক**, উপ-চুক্তি (sub-contracting) সম্পাদনের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে এবং পণ্যের মান বৃদ্ধি নিশ্চিত করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে চেষ্টা করা; **দুই**, জাতীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের একটি পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত মূল্য সংযোজন প্রবাহ (value chain) নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক মূল্য প্রবাহের (global value chain) সঙ্গে মেলবন্ধন সৃষ্টি করা।

আমরা সংগত কারণেই আশাবাদী, উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইতিমধ্যে যেভাবে বিকশিত, সম্প্রসারিত এবং স্থায়িত্ব লাভ করেছে সেটি শুধু অব্যাহত নয়, ভবিষ্যতে আরো বেগবান হবে। ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, বৃহৎ শিল্পের কেবল সম্পূরক নয়; প্রতিযোগী হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তবে প্রয়োজন, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ধারণ করা এবং তিনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের তথা শিল্পায়নের যে ভিত রচনা করেছেন এবং সেই ভিত আরো মজবুত করার লক্ষ্যে দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা এই খাতের উন্নয়নে যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন সেই কার্যক্রম বাস্তবায়নের গতি সঞ্চারে আরো আন্তরিক ও নিবেদিত হওয়া। স্মরণযোগ্য, উন্নয়ন নিছক কোনো তাত্ত্বিক কিংবা যান্ত্রিক বিষয় নয়– এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, এবং এই প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করার জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম, রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও শতভাগ পেশাদারিত্ব।

তথ্যপঞ্জি

[১] Civil War in Pakistan, *News Week*, May 05, 1971.

[২] দারিদ্র্যপীড়িত, শোষিত-বঞ্চিত পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর এই হৃদয়-নিঃসারিত ভালোবাসার কথা তথা তাঁর রাজনীতির মূল প্রেরণার কথা বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন জনসভা ও জাতির উদ্দেশে ভাষণে অসংখ্যবার উচ্চারণ করেছেন। তাই 'বাংলার দুঃখী মানুষের হাসি ফোটানোর জন্য আমি রাজনীতি করি', বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্যের সপক্ষে কোনো বিশেষ সূত্র উল্লেখ থেকে আমরা বিরত থাকলাম।

[৩] বারকাত, আবুল, *বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ*, মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৫ পৃ. ৩২।

[৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রথমভাগ, পৃ. ১।

[৫] ইসলাম, নূরুল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: কাছ থেকে দেখা, প্রথমা প্রকাশন, ২০২০ পৃ. ১৯।

[৬] হারুন-অর-রশীদ, *আমাদের বাঁচার দাবী*, ৬-দফার ৫০ বছর, বাংলা একাডেমি, ২০১৬, পৃ. ৪৬।

[৭] রহমান, শেখ মুজিবুর, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, জুন, ২০১২, পৃ. ২৩৪।

[৮] বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত নথি, ৩রা মে, ১৯৭৩, (*অসমাপ্ত আত্মজীবনীর* প্রথম পাতায় উদ্ধৃত)।

[৯] *প্রথম আলো*, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০, পৃ. ১।

[১০] রহমান, মাহবুবর, *বঙ্গবন্ধুর শাসনকাল ১৯৭২-১৯৭৫*, নূহ-উল আলম লেনিন কর্তৃক সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ *ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু*, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, আগস্ট, ২০১১, পৃ. ২৫৮।

[১১] ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৫-২০২০) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ২৮৭।

[১২] ইসলাম, নজরুল, *বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম*, Eastern Academic, ২০১৭ পৃ. ৭।

[১৩] বাজেট বক্তৃতা ১৯৭৫-১৯৭৬, পৃ. ৫।

[১৪] আহমেদ, মমতাজ উদ্দীন-এর "Women Entreprenenrship Development in the Small and Medium Enterprises in Bangladesh: Prespects, Realities and Policies" International Journal of SME Development, Volume-1, Issue-1, April 2014, প্রবন্ধে উদ্ধৃত Ayyagari Meghana; Demirgue – Kunt, Asli and Makisomovic, Vojislav. Small Vs Young Across the World: Contribution to Employment, Job Creation and Growth. Policy Research Working Paper No WPS 5631, Washington D.C. World Bank, 2011

[১৫] আহমদ, মমতাজ উদ্দিন, A Theoretical Framework for Analyzing the Growth and Sustainability of Small and Medium Enterprizes (SMEs), International Journal of SME Development, Issue-2, December 2016, p. 7.

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন ও বাংলাদেশ

ড. এম. খায়রুল হোসেন *

সংক্ষিপ্তসার

বঙ্গবন্ধু একটি আদর্শের নাম। যে আদর্শের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনের পাশাপাশি দেশপ্রেম, মানবতাবোধ ও সাধারণ মানুষের প্রতি নিখাদ ভালোবাসা রয়েছে। বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা উপহার দিয়ে তিনি তাঁর আদর্শের প্রয়োগিক অভিব্যক্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই তো বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এখন সর্বজনীন– সারা বিশ্বের দরিদ্র, বঞ্চিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের জন্য মুক্তির মূলমন্ত্র। তাঁর চিন্তার মূল কেন্দ্রবিন্দুতেই ছিল মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, সবার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থার পাশাপাশি সব ক্ষেত্রে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি চারটি মূলনীতি– সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা অনুসরণ করেছিলেন। সমাজতন্ত্রকে তিনি তখনকার বিদ্যমান অন্যান্য দেশের মডেলের মতো অবিকল বিবেচনা না করে দেখেছিলেন সবার জন্য কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি, মৌলিক চাহিদা পূরণসহ অসমতা দূর করে গ্রাম-শহরভেদে সবারমুখে হাসি ফোটানোর উপায় হিসেবে। কাজেই বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক তথা উন্নয়ন দর্শনকে বুঝতে হলে তাঁর নেতৃত্বের এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের গতিশীলতাকে বুঝতে হবে। তিনি বাঙালি জাতির স্বার্থের ব্যাপারে ছিলেন আপসহীন, কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। তিনি বারবার কারাগারে গিয়েছেন বাঙালির দাবি আদায়ের মাধ্যমে তাদের জন্য একটি সুন্দর সমাজ উপহার দেওয়ার জন্য। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ত্যাগের ও সাধনার। শিক্ষাকে দক্ষতা বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার বিবেচনায় একটি শিক্ষিত জাতি ছাড়া একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়া সম্ভব নয় বলে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন। পরিকল্পিত উপায়ে কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং অর্থনীতির সব শাখায় উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতির আকার অনেকগুণ বড় করে, বণ্টন ব্যবস্থা সুষম করেই তিনি সোনার বাংলা গড়ার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তাঁর অর্থনৈতিক দর্শনের মূলমন্ত্র এখানেই নিহিত। এ দর্শনের আলোকে বর্তমানে বাংলাদেশে সোনার বাংলার গড়ার কার্যক্রম অব্যাহতভাবে

* ড. এম. খায়রুল হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক। দীর্ঘ ৩৭ বছরের বেশি সময় শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি দেশি-বিদেশি সংস্থার গবেষণা কর্মের সাথে যুক্ত। তিনি মে ২০১১ থেকে দীর্ঘ ০৯ বছর বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। পুঁজিবাজার বিকাশে তাঁর নেতৃত্বে ১০০ টির বেশি সংস্কার করা হয়েছে। এর পূর্বে তিনি আইসিবির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। ড. হোসেন রাশিয়ান প্লেখানভ ইউনিভার্সিটি অব ইকোনোমিক্স থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি শেষে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের প্রেয়রিভিউ এ এন্ড এম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স বিষয়ে সিনিয়র ফুলব্রাইট স্কলারশীপে পোস্ট ডক্টরেট ফেলোশীপ করেছেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যান ও হাজী মুহম্মদ মুহসিন হলের প্রভোস্ট ছিলেন। আর্থ-সামাজিক, পরিবেশ, জ্বালানী-বিদ্যুৎ, ব্যবসায়, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, গ্রামীণ জীবন যাত্রা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তার ৭০টিরও বেশি প্রবন্ধ ও গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

চলছে এবং পৃথিবীর দেশ থেকে দেশে অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য বদলের সোপান হিসেবে কাজ করছে।

বিষয়সূচক শব্দসমূহ (Key Words): অর্থনীতি, উন্নয়ন, দর্শন, বৈষম্য, দেশপ্রেম, সোনার বাংলা।

সূচনা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান, যিনি অসামান্য আত্মত্যাগের মাধ্যমে জাতিকে উপহার দিয়েছেন এক স্বতন্ত্র আবাসভূমি, নতুন পতাকা আর নিজ স্বজাতীয় সংগীত, যিনি বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে তাদের খাদ্য, বস্ত্র আর বাসস্থানের নিশ্চয়তা দিয়ে সমাজ ব্যবস্থাকে বদলে ফেলে সোনার বাংলা গড়ার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই জাতির পিতার অর্থনৈতিক দর্শন শুধু তাঁর সময়ে গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে নিতান্তই অবিচার করা হবে। আর সে কারণেই তাঁর গৃহীত পদক্ষেপের অন্তর্নিহিত মর্মবস্তু ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় মনে করছি।

মাত্র উনিশ বছর বয়সে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। তখন থেকে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট-সৃষ্ট বেদনার অনুভূতির পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসনের নিষ্পেষণে বাঙালি জাতির দুর্দশা তাঁকে দারুণভাবে পীড়িত করে। এককালে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী বাংলার ১৭৫৭ সালে পলাশির আম্রকাননে যুদ্ধের মধ্যে দুর্দশার শুরু হয়ে ১৯৪৭ সালে খণ্ডিত বাংলায় তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক ভাবে শোষিত পূর্ব বাংলার (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) জনগণের জন্য নতুন ধরনের অবহেলা আর বৈষম্যে তাঁকে স্বদেশপ্রেম এবং বাঙালি জাতির দুর্দশা লাঘবে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে। দিনে দিনে বাঙালির স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগঠিত হয়ে এবং নিজের লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে বঙ্গবন্ধু ধাপে ধাপে স্বাধীনতা অর্জনে সফল নেতৃত্ব দেন। তারই ফলে ১৯৭১ সালে 'বাংলাদেশ' নামে এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেয়। বঙ্গবন্ধু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘবে, শোষণ-বঞ্চনা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে আর সমাজ পরিবর্তনের জন্য নিজেকে ব্যাপ্ত রেখেছিলেন।

পৃথিবীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমাজ পরিবর্তনের কথা অনেকেই বলে কিন্তু এর জন্য যথাযথ কার্যক্রম শুরু করে সমাজ-জীবনে পরিবর্তন নিশ্চিত করার কাজটি কেউ করেনা। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক-দার্শনিক লিও টলস্টয় বলেছেন 'প্রত্যেকে বিশ্ব পরিবর্তনের কথা বলে কিন্তু নিজেকে পরিবর্তনের কথা কেউ ভাবে না (টলস্টয়, ২০২০)। বঙ্গবন্ধু শুধু সমাজ পরিবর্তনের দর্শনই জনসম্মুখে উপস্থিত করেননি, বরং স্বাধীনতার মহান স্বপ্নদ্রষ্টা নিজের আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম, সাধনা ও জনগণকে সংঘবদ্ধ করার মাধ্যমে জাতিকে স্বাধীনতা উপহার দিয়ে গেছেন। বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশধারা বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, যথাযথ নেতৃত্বেই সমাজ বিবর্তনের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করে প্রশাসন থেকে শুরু করে দেশের সমগ্র প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়নের চেতনায় উদ্দীপ্ত করে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত করার মধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের উন্নয়নের ভিত্তিতে যোগ করেছেন নতুন উপাদান। রেখে গেছেন উন্নয়ন গতিকে ত্বরান্বিত করার মৌলিক দর্শন। বঙ্গবন্ধুর দর্শনের আলোকে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দেখানো পথে তারই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষুধা-দারিদ্র্য আর বৈষম্য দূরীকরণে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছেন সোনার বাংলার গড়ার সঠিক কক্ষপথে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক সূচকের

গুণগত ও সংখ্যাগত পরিবর্তন আর সর্বস্তরের জনগণের সবধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশে সূচিত হয়েছে নতুন দিগন্ত, বিশ্বের কাছে যা অনুকরণীয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের একটি নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা, যাতে করে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের সঙ্গে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব তথা সোনার বাংলা গড়ার যোগসূত্রের গভীরতা অনুধাবন করা যায়।

গবেষণার পদ্ধতিগত দিকসমূহ

গবেষণার বিষয়টিতে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থাকায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন বিভিন্ন বিষয়ের গতিময়তা বিশ্লেষণ করতে হয়েছে, অন্যদিকে রাজনীতি-অর্থনীতি, বৈষম্য-সমতা, দারিদ্র্য-উন্নয়ন-এ রকম নানা বৈশিষ্ট্য ও প্রপঞ্চ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীতা রয়েছে। তাই পরিমাণগত পরিবর্তনের ধারা ও মাত্রা নির্ণয়ের জন্য যেমন বিভিন্ন চলক সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন নীতিপ্রবিধি, অধিকার, সচেতনতাবোধ, শোষণ-নিপীড়নসহ বহুবিধ গুণগত চলকের তথ্যের প্রয়োজন হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর নিজের রচিত বই, তাঁর ভাষণ, সিদ্ধান্তসমূহের দলিল প্রধান তথ্য-উপাত্তের উৎস হিসেবে কাজ করেছে। শেখ হাসিনার বিভিন্ন বই, প্রবন্ধ ও রচনা যেখানে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবন এবং অর্থনৈতিক দর্শনের ইঙ্গিত রয়েছে তারও বিশ্লেষণ হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা কর্মসূচির দলিল, বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্য গৃহীত কার্যাবলির দলিল, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিল, ১৯৭২-৭৫ সময়ে বাজেট দলিল অন্যতম তথ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করেছে। বিভিন্ন রাজনীতিবিদ-অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও গুণীজন কর্তৃক রচিত বই, প্রবন্ধ ও পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন লেখা এ গবেষণার উপসংহারের সপক্ষে মূর্ত যুক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য, তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় তাঁর জীবনদর্শন, মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, আন্দোলন, সংগ্রাম ও উন্নয়নভাবনা সম্পর্কে আহরিত জ্ঞান এ গবেষণা ফলাফলের যথার্থতা বিচারে সহায়তা করেছে। উল্লেখ্য, এসব দলিল ও তথ্যভান্ডার সংগ্রহ করার পর তাদের বস্তুবিশ্লেষণের (Content analysis) মাধ্যমে সোনার বাংলাসহ বিভিন্ন ধারণার অন্তর্নিহিত মর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির নিবিড় সংশ্লেষের অনুসন্ধানও করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত, আন্দোলন, দাবি ইত্যাদি পর্যালোচনায় তাদের যৌক্তিকতা, প্রেক্ষাপট ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনুধাবনের প্রচেষ্টা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর দর্শনের কালপরিক্রমায় বাংলাদেশে এর বাস্তবতা, চলমান ধারা, ভবিষৎ গতিধারা ও বিশ্বে সাধারণ জনগণের জন্য এর উপযোগিতার বিষয়টি বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

দেশপ্রেম ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা : বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের অন্যতম ভিত্তি

'একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।' (রহমান, ২০১২)।

এই উদ্ধৃতিই দেশ ও মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর নিখাদ ভালোবাসার অন্তর্নিহিত মর্ম ব্যাখ্যা করতে যথেষ্ট। বাঙালি জাতির প্রতি বৈষম্য, নিপীড়ন, শোষণ, অবেহেলা, অসম্মান আর এরই সঙ্গে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের অভাব বঙ্গবন্ধুকে জাতির ভাগ্যোন্নয়নে যথাসময়ে পদক্ষেপ নিতে তাড়িত করে। তিনি বলেছিলেন

এদেশের জনগণের সঙ্গে তাঁর শুধুই ফুল আর ভালোবাসা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। বাংলার মানুষকে 'ভালোবাসেন'– এটি ছিল তাঁর শক্তি, কিন্তু তাদেরকে বেশি ভালোবাসতেন, এটি ছিল তাঁর দুর্বলতা। তিনি বলেছেন 'বাংলার মানুষের ভালোবাসার প্রতিদানে আমার দেবার কিছু নাই। একমাত্র প্রাণ দিতে পারি। আর তা দেবার জন্য সবসময় প্রস্তুত আছি (রহমান, ভাষণ, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)। এই অনুভূতিই পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য তার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ করে। তিনি বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য প্রতিবাদ ও আন্দোলনকে ধীরে ধীরে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মানুষের প্রতি ভালোবাসা আর বঙ্গবন্ধুর প্রতি সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বঙ্গবন্ধুকে সর্বদাই রেখেছে 'উন্নত শির' দৃঢ়চিত্ত অসীম সাহসী জনবৎসল (সিদ্দিক, ২০১১)। আমি আমার বাংলার মানুষকে ভালোবাসি, আমি আমার বাংলার আকাশকে ভালোবাসি, আমি আমার বাতাসকে ভালোবাসি, আমি আমার বাংলার নদনদীকে ভালোবাসি' (রহমান, ভাষণ, ৯মে, ১৯৭২)। বাংলার মানুষ, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু আপস করেননি। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পরই বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি না দেওয়ার প্রতিবাদের কারণে তাকে কারাগার বরণ করতে হয়েছে।

বাঙালি জাতির শোষণ-বঞ্চনার করুণ ইতিহাস এবং গৌরবোজ্জল অর্থনৈতিক অতীতের পর্যালোচনা তাকে দারুণভাবে পীড়িত করে। তাই সে হৃত গৌরব ফিরিয়ে এনে বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনার প্রবল ইচ্ছা তাঁকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এদেশের কল্যাণে নিবেদিত থাকতে দেখা গেছে। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব, বঞ্চনা ও নিপীড়ন দূরীকরণে সংঘবদ্ধ শক্তিকে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তাই ছাত্রলীগ গঠন থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে দেশের মানুষকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, 'বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্থপতি নন, তিনি তাঁর দেশ ও তাঁর সত্তার মধ্যে কখনও কোন পার্থক্য স্বীকার করেননি।' (মুহিত, ২০১৭)। এদেশের মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের সাথি হয়ে তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন।

তিনি মানুষকে সম্পৃক্ত করে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তাদের অর্থনৈতিক করুণ অবস্থা তাঁকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিবাদী এবং অধিকার আদায়ে আপসহীন নেতা হিসেবে পরিণত করেছে। 'তাঁর জীবনে জনগণই ছিল অন্তঃপ্রাণ। মানুষের দুঃখে তাঁর মন কাঁদত। বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাবেন, সোনার বাংলা গড়বেন এটাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য– এই মৌলিক অধিকারগুলো পূরণের মাধ্যমে মানুষ উন্নত জীবন পাবে, দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্তি পাবে, সেই চিন্তাই ছিল প্রতিনিয়ত তাঁর মনে।' (শেখ হাসিনা ২০২০)

অর্থনৈতিক মুক্তি : বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের মূল ভিত্তি

লেলিনের মতে,'রাজনীতি হলো অর্থনীতির একটি নিবিষ্ট অভিব্যক্তি'। (*New York Times*, April 03, 2017)। বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক বঞ্চনার অবসান এবং তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়টি বঙ্গবন্ধু এক এবং অভিন্ন লক্ষ্যের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতেন। আর সে কারণেই পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালির অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বিরাট বৈষম্য বঙ্গবন্ধুকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য আলাদা স্বদেশভূমি প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর করেছে।

পাকিস্তান শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭১) বৈষম্যের কিছু পরিসংখ্যান জাতি হিসেবে বাঙালির বঞ্চনা ও অবহেলার চিত্রকে তুলে ধরতে যথেষ্ট। পাট ও পাটজাত দ্রব্য ছিল পাকিস্তানের রপ্তানি তালিকায় সবচেয়ে বেশি অবদানকারী পণ্য। এই পাট পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও এই খাতের রপ্তানি আয়ের শতকরা নব্বই ভাগ খরচ হতো পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানি ব্যয় নির্বাহের নিমিত্তে। শিল্পকারখানা নির্মাণের ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রধান্য দেওয়া হতো। সেখানে ১৫০টি বৃহৎ শিল্প ইউনিট গড়ে উঠলেও পূর্ব পাকিস্তানে তার সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৭টি। আর এসব শিল্প ইউনিটে সরকারি বরাদ্দের ক্ষেত্রে আনুপাতিক নীতি পরিহার করে চালু করা হয়েছিল বৈষম্যের সংস্কৃতি। ১৯৫৩-৫৬ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ শিল্প ইউনিটের জন্য ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল মাত্র ২ কোটি টাকা।

অর্থনৈতিক চাকাকে সচল করার জন্য, অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি ও মোট দেশজ উৎপাদনে অবদান রাখার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পাকিস্তান শাসনামলের ২৩ বছরের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলে প্রতীয়মান হয় যে, সর্বক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপাত্য ও অগ্রাধিকার ছিল। প্রায় সব বড় পদে চাকরিতেই বাঙালিদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। স্বভাবতই ভোগ, জীবন-মান উন্নয়ন আর সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল।
রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যভিচারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ ধরনের বৈষম্য বঙ্গবন্ধুকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তাই অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূরীকরণের হাতিয়ার হিসেবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি তিনি দীর্ঘ মেয়াদে এবং ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। একমাত্র স্বাধীনতাই যে বাঙালি জাতির ভাগ্যোন্নয়নে মূল নিয়ামক শক্তি, একথা তিনি অনুধাবন করেছিলেন ১৯৭১ সালের বহু আগেই। তাই তো আমরা দেখি, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পঞ্চাশের দশকে মন্ত্রী থাকাকালীন, ৬-দফা আন্দোলন সর্বত্রই বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে। পাকিস্তান শাসনামলে ১৮ বার বাঙালির দাবি আদায়ের আন্দোলনের কারণে জেল খেটেছেন এবং জীবনের মূল্যবান ১২ বছরেরও অধিক সময় কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। কিন্তু বাঙালির স্বার্থের বিনিময়ে আপস করেননি। তাই তো দিনে দিনে নিজের অসীম আত্মত্যাগের মাধ্যমে তিনি হয়েছিলেন বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক– তাদের সব সমস্যার ত্রাণকর্তা। বস্তুত, যুগে যুগে পৃথিবীতে দেশে দেশে এমন কিছু মহান নেতৃত্বের আর্বিভাব হয়, যাদের সম্মোহনী শক্তির প্রভাবে দেশের সব স্তরের মানুষ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা বোধ করেন না। বাঙালির সৌভাগ্য যে এদেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধুর মতো এমন মহান পুরুষ জন্ম নিয়েছিল। তিনি নিজের আত্মত্যাগের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে জীবন উৎসর্গ করে হলেও মাতৃভূমির মুক্তি ও জনগণের কল্যাণে ব্রত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পৃথিবীর খুব স্বল্পসংখ্যক দেশেই এ রকম মহানায়কের আবির্ভাব হয়েছে, যারা কর্মে, আত্মত্যাগে, দেশপ্রেমে, নেতৃত্বগুণে ও মহানুভবতায় এবং লক্ষ্য অর্জনের সফলতায় বিশ্বব্যাপী প্রভাব রাখতে পেরেছেন। তাই তো একদিকে বাংলাদেশের অপর নাম বঙ্গবন্ধু, অন্যদিকে বিশ্বে মুক্তিকামী মানুষের অন্যতম আদর্শ শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়েও ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরীহ বাঙালি জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারই পূর্বানুমানে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আরো

বলেছিলেন, তোমাদের যা কিছু আছে, তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে (রহমান, ভাষণ, ৭ মার্চ, ১৯৭১)। এরপর ২৫শে মার্চের কালরাত্রির প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার পর দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও দেশটি ছিল ভয়ানকভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত। মুক্তিযুদ্ধকালীন তেতাল্লিশ লক্ষ ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা হয়েছিল, ৩ কোটি মানুষ হয়েছিল সর্বস্বান্ত আর ১ কোটি মানুষ দেশ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, যাদের সর্বস্ব লুট করা হয়েছিল (আবুল বারাকাত, ২০১৫)। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আমি যখন বাংলাদেশ সরকার পেলাম, যখন জেল থেকে বের হয়ে এলাম, তখন আমি শুধু বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষই পেলাম। ব্যাংকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। আমাদের গোল্ড রিজার্ভ ছিল না। শুধু কাগজ নিয়ে আমরা সাড়ে সাত কোটি লোকের সরকার শুরু করলাম। আমাদের গুদামে খাবার ছিল না।' (রহমান, ভাষণ, ২৬ মার্চ, ১৯৭৫)

উত্তারাধিকার সূত্রে মোট ও মাথাপিছু স্বল্প জিডিপির বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করে বিপর্যস্ত অর্থনীতি নিয়ে। রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, রেললাইন, বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ নানাবিধ অবকাঠামো ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত-বিধ্বস্ত। সেই সঙ্গে কর্মক্ষম বয়সের লক্ষ লক্ষ মানুষ শহিদ হওয়ার কারণে অর্থনীতি পুনর্গঠন কাজটি হয়ে পড়ে দুরূহ। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তির অভাব ভোগ্যপণ্য জোগানে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ১৯৭২ সালে জিডিপি ৬২৯ কোটি টাকায় নেমে আসে, যা যুদ্ধের আগে ১৯৭০ সালে ছিল ৮৯৯ কোটি টাকা। অবশ্য বিপর্যস্ত অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৭৩ সালেই জিডিপির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৮০৬ কোটি টাকায়। বঙ্গবন্ধু দেশগড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন চারটি মূলনীতি– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে (রহমান, ভাষণ: ৭ই জুন ১৯৭২; সংবিধান, অনুচ্ছেদ এ ৯, ১০, ১১, ১২)। বঙ্গবন্ধু বলতেন, অর্থনৈতিক পদ্ধতি কোনো 'ইজম' ভাড়া বা আমদানি করে কাজ করবে না। সেটা আমাদের দেশে কিংবা অন্য দেশেও নয়। আমাদের মাটি ও সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সঙ্গে মিল রেখেই আমাদের অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে (হারুন-অর রশিদ, ২০২০)। ১৯৭২ সনের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে কার্যকর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধনের উল্লেখ রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৫)। এই সব মৌলিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা, জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ১৫.ক), কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমান বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৫.খ)। যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৫.গ) এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৫.ঘ) বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুকে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনর্গঠন, অসহায় আশ্রয়হীন মানুষের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রেখে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন, নারী-পুরুষ ভেদাভেদ কমানো, তথ্য ও ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সবার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য অসাধ্য কর্মযজ্ঞ ও গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধু দেশপ্রেম গড়া বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে জনবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার কৌশলগত উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে। যে দর্শন সমকালীন ধ্যানধারণা বা বিশ্বে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় পরিচালনা-কাঠামোর সঙ্গে হুবহু মিল রেখে নয় বরং এদেশের দরিদ্র ও

মেহনতি মানুষকে উন্নত জীবন উপহার দেওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সদিচ্ছা থেকে, সব জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্য আশ্রয়স্থল, প্রেরণার উৎস। তাই তো তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন– রচনা করে গেছেন জনগণের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার মৌলিক ভিত্তি।

স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সময় পেয়েছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছরের মতো। এরই মধ্যে দেশীয়ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র মোকাবিলার পাশাপাশি অর্থনীতি ও সমাজ বিবর্তনে নিয়েছিলেন যুগান্তকারী উদ্যোগ। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ব্যাপ্তি ও ধরন সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দেবে।

জনগনকে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অংশীদার করা, দক্ষ জনবল সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু ব্যাংক-বীমা ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, এসব প্রতিষ্ঠানের বড় বড় পদে পশ্চিম পাকিস্তানিরাই সাধারণত পদায়িত ছিল। জাতীয়করণের ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধু ঢালাও নীতি অনুসরণনা করে বাস্তবসম্মত এবং প্রতিষ্ঠানের ধরন বিবেচনায় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ঐ সময়েই পুঁজিবাজারের প্রকৃতি বিবেচনায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জকে জাতীয়করণের আওতাবহির্ভূত রেখেছিলেন– যা তার অপরিসীম প্রজ্ঞার পরিচয় বহনকরে।

স্বাধীনতার পর দেশে বিপুল খাদ্য ঘাটতির কথা বিবেচনা করে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কৃষকদের খাজনা হ্রাস ও বকেয়া খাজনা মওকুফের পাশাপাশি কৃষিঋণ প্রদান ও উন্নত বীজ সরবরাহ, পুরোনো নলকূপ মেরামত ও নতুন নলকূপ বসানো, জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বছরে একাধিকবার জমি ব্যবহারের প্রচলন করাসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ড শুরু করেন। একই সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, জমির বহুমুখী ব্যবহার, শস্যের বিপণন, প্রয়োজনীয় পুঁজির জোগান ইত্যাদি মাথায় রেখে বঙ্গবন্ধু কৃষকদের নিয়ে বাংলাদেশের উপযোগী সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। সমবায়কে কেন্দ্র করে কৃষিতে সারের চাহিদা, ভোগ্যপণ্যের বর্ধিত উৎপাদন ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শ্রমনিবিড় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশকে সোনার বাংলা রূপে গড়তে অসংখ্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘমেয়াদি কৌশল এবং বাংলাদেশের জনগণের শান্তি ও স্বস্তির কথা চিন্তা করে বঙ্গবন্ধুকে অনেক আপাতবিতর্কিত অথচ দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে (কাদের, ২০১১)। সরকার কাঠামো নির্ধারণ, বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন, শরণার্থী পুনর্বাসন, অবকাঠামো নির্মাণ, পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার রূপকল্প তৈরি, সংবিধান প্রণয়ন, রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক বিধিবিধান নির্ধারণ, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন, রাস্তাঘাট-সেতু নির্মাণ ও বন্দর মেরামত, শিল্পের জাতীয়করণ ও National Industries Division (NID) বিভাগ প্রতিষ্ঠা, শক্তিশালী পরিকল্পনা কমিশন গঠনসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন (ইমাম, ২০১১)।

বৈষম্যহীন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রণীত হয় বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮)। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের আলোকে ঐ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ নির্ধারিত হয়েছিল। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য নিম্নরূপ (প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ১৯৭৩):

- পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য হ্রাস। লক্ষ্য অর্জনের কৌশল হবে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সমতাভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন।
- অন্যান্যের মধ্যে কৃষি ও শিল্পের পুঁজিগঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি। আনুষ্ঠানিক খাতসমূহে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রাম শহরে স্বেচ্ছাশ্রমের বিকাশ।
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা (৩% থেকে ৫.৫%) এবং বণ্টন নীতিমালা এমন রাখা, যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির হার গড় আয় বৃদ্ধি থেকে বেশি হয়।
- বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসে সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি।

বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্গঠন করতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর সময়কালে ও পূর্বে সর্বমোট চারটি বাজেট প্রস্তাবনা (১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪, ১৯৭৪-৭৫, ১৯৭৫-৭৬) উপস্থাপন করা হয়। এসব বাজেট জনগণের সহযোগিতায় ও জনগণের অংশগ্রহণে জনকল্যাণে নিবেদিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার একদিকে বিপর্যস্ত অবকাঠামো গড়ে তোলা, জনগণের ও রাষ্ট্রের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হওয়া আর মানুষের চেতনায় পরিবর্তন এনে সমাজ গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে দেশকে উন্নয়নের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য অসংখ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।

বিভিন্ন বছরে বাজেটে গৃহীত পদক্ষেপ ও কার্যাবলির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সরকার স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ব্যক্তিগত কর হারের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল করের প্রবর্তন করা হয়েছে, যাতে উচ্চ আয়ের জনগণকে বেশি হারে কর দিতে হয়। করের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরোক্ষ করের চেয়ে প্রত্যক্ষ কর হার বেশি ধার্য করা হতো (বালা, ২০২০)। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন 'সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। শোষিত, নির্যাতিত ও লুণ্ঠিত বাংলাদেশের সমাজদেহে সমস্যার অন্ত নেই। এই সমস্যার জটগুলোকে খুলে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে।' (রহমান,ভাষণ, ১৫ ডিসেম্বর১৯৭৪)। বস্তুত, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে, যে বাংলাদেশে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান আর চিকিৎসার অভাবে কেউ থাকবে না, যেখানে গ্রাম-শহর, নারী-পুরুষ আর মানুষে-মানুষে বৈষম্য থাকবে সহনীয় পর্যায়ে, যেখানে পরস্পরের সহযোগিতায় সকলেই এগিয়ে আসবে। এমন দেশ গড়তে বঙ্গবন্ধু ত্যাগ ও সাধনার জন্য জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি পেয়েছি, আমার যা পাওয়ার। আমার চেয়ে বেশি কোনো দেশের কোনো নেতা কোনো দিন পাননি। সেটা হলো আপনাদের ভালোবাসা । যে ভালোবাসা আপনারা আমাকে দিয়েছেন। আপনারা আমাকে দোয়া করুন আমি যেন সেই ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি।...আমি বাংলার প্রত্যেক মানুষকে মনে করি আমার ভাই, মাকে মনে করি আমার মা, ছেলেকে মনে করি আমার ছেলে। এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। একে গড়তে হবে। চাই ত্যাগ ও সাধনা। ত্যাগ ও সাধনা ছাড়া এ দেশকে গড়া যাবে না।' (রহমান, ভাষণ ৯ মে, ১৯৭২)

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের অন্যতম উপাদান ছিল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের অন্তর্নিহিত শক্তিকে শানিত করা এবং মেধার বিকাশ ঘটানো। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার জন্য যে সোনার মানুষের কথা বলেছেন সেই মানবসম্পদ তৈরির জন্য তিনি শিক্ষা-প্রশিক্ষণকে অন্যতম বাহন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি শিক্ষায় বিনিয়োগ সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করতেন। (রহমান, ভাষণ, নভেম্বর ১৯৭০)। যে শিক্ষা মানুষকে শুধু দক্ষ ও সৃজনশীলই করবে না, বরং তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত করার পাশাপাশি ত্যাগ ও সাধনার ব্রতে উজ্জীবিত করবে। তাই তো স্বাধীনতার পরে যারা উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গিয়েছেন তাদেরকে তিনি উন্নত শিক্ষা-প্রযুক্তিতে শিক্ষিত হয়ে ফিরে এসে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগের কথা বলেছেন।

পাকিস্তানিরা একদিকে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছিল, অন্যদিকে জাতিকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে গণহারে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। পুরোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মেরামত, নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, নারীশিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণের ব্যবস্থা, দক্ষ জনবল গড়ার গুরুত্ব অনুধাবন করে বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান, নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন, দেশ গড়ার কারিগর হিসেবে জাতীয় কর্মে ও উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা রাখার যোগ্য করে তোলার জন্য একটি সর্বজনীন শিক্ষা পদ্ধতি চালু করতে চেয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠনসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জ্ঞানভিত্তিক, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত এক ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণের উপযোগী মানবসম্পদ তৈরির ভিত্তি রচনা করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ও শিল্পায়ন

দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের গতি ত্বরান্বিত করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা, প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ লাভ করে নিজেদের দক্ষতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে চিন্তাচেতনায় মৌলিক পরিবর্তন সাধনে শিল্পায়নের কোনো বিকল্প নেই। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়নের পাশাপাশি দ্রুত শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু নিজের ধ্যানধারণা বাস্তবায়নে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই।

বৃহৎ শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং তাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রাধান্য, পূর্ব পাকিস্তানের কর্ণফুলী পেপারমিল, প্লাটিনাম জুবিলি জুটমিলসহ নানাবিধ শিল্পকারখানা পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে তুলে দেওয়া এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রায় সব ক্ষেত্রে পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণ বঙ্গবন্ধুকে দারুণভাবে পীড়িত করে। পাকিস্তান শাসনামলেই ১৯৫৭ সনে বঙ্গবন্ধু ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প আইন প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্বে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন (বর্তমানে 'বিসিক', পূর্বে ইপসিক)। দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখার প্রচেষ্টা থেকেই তিনি এ কাজটি করেছিলেন। ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে বিসিকের সহায়তায় স্থাপিত হয় দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রেস, রায়ের বাজারের বেঙ্গল সিরামিক এবং গুলিস্তান ও নাজ সিনেমা হলের মতো প্রতিষ্ঠান।

বঙ্গবন্ধু যখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তখন তিনি এদেশের শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশে বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৬ বঙ্গবন্ধু জানালেন যে, ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য আলাদা করপোরেশন গঠনে একটি বিল প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে পরবর্তী বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপন করা হবে। প্রস্তাবিত করপোরেশনের মূলধন হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১ কোটি টাকা চাওয়া হবে। পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের অধিকাংশই পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে আহরিত হলেও তার বৃহদংশ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ন্যায্য হিস্যা দাবি করেছেন। তিনি বারবার বলেছেন যে রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ যেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও শ্রমিক কল্যাণে এবং শিল্পবিকাশে ব্যয় হয়। পাকিস্তানের দুই অংশে অসমতা ধীরে ধীরে হ্রাস করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী থাকাকালীন নানাবিধ উপায়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। তাঁর প্রস্তাবনার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো : পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা অর্থনীতি প্রচলন, প্রাদেশিক সরকারের আমদানি লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষমতা প্রদান, পাট, তুলা ও তৈরি পোশাকের মতো শিল্পের নিয়ন্ত্রণ প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত, পূর্ব পাকিস্তানে আমদানি-রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় স্থাপন, সাপ্লাই ও ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মহাপরিচালকের এক পৃথক কার্যালয় পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা, বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৫০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ এবং চা-শিল্প বিকাশে নীতিসহায়তা প্রণয়নে পূর্ব পাকিস্তানি উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য দেওয়া (আতিউর রহমান, ১৪ই আগস্ট ২০১৮)।

বঙ্গবন্ধু এইভাবে দিনে দিনে বাংলার দুঃখী, মেহনতি ও শোষিত মানুষের বঞ্চনা লাঘবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দাবি আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন– তীব্র থেকে তীব্রতর করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় সূচিত হয় ৬-দফা আন্দোলন। ৬-দফা কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে যে দাবিগুলো পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের পক্ষে কাজ করেছে তা হলো : প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলো স্ব স্ব প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বে থাকা; পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজির পাচার বন্ধ হওয়া, অধিকন্তু, পৃথক ব্যাংক রিজার্ভ গঠন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি প্রবর্তন; কর ও রাজস্ব আদায় ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে তার ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি অংশ দেওয়া; বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্য দুটি প্রাদেশিক সরকারের ভিন্ন ভিন্ন হিসাব পরিচালনা করা এবং সমহারে অথবা পূর্বনির্ধারিত হারে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মেটাতে অবদান রাখা; দেশের অভ্যন্তরে পূর্ব থেকে পশ্চিম বা পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বিনা শুল্কে পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা থাকা এবং বিদেশের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের বাণিজ্য চুক্তি করার ক্ষমতা প্রদান (৬-দফা কর্মসূচি, ১৯৬৬)।

বঙ্গবন্ধু এসব দাবির ফলে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকারকেই সমুন্নত করতে চাননি, বরং এসব দাবির ব্যাপারে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এই ভূখণ্ডে শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশের (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের) অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। নিজের জীবনের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে শুধু এই মাটি ও মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে বঙ্গবন্ধু আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বারবার কারাবরণ করেছিলেন শুধু এই দেশের সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। তারপর ১১ দফা আন্দোলন,'৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মুক্তি ও স্বাধীনতার ডাক দেওয়ার পরে কারাবরণে যেতে বাধ্য হন। নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশ গড়ার লড়াইয়ে নিজেকে উজাড় করে দেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে সমাজ ও অর্থনীতি বিনির্মাণে শূন্য হাতে যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল। অবকাঠামোর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুকে শিল্পকারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও নির্মাণে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাস করতেন,'সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণই জনগণের ভাগ্য নির্ধারণ করে'। এই বিশ্বাস থেকেই দেশের সমসাময়িক বিদ্যমান অবস্থা বিবেচনায় বিচ্ছিন্নভাবে শিল্প-উদ্যোগে মনোনিবেশ সম্ভবপর নয় বলেই কৃষি, শিল্প, পুঁজির জোগান, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, কর ও রাজস্বনীতি, বন্দরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন সাব-সেক্টরে বঙ্গবন্ধু সরকারকে একসঙ্গে হাত দিতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচালনার অভিজ্ঞতা না থাকলেও বাংলাদেশ ব্যাংকসহ চালু করতে হয়েছে তফসিলি ব্যাংক ব্যবস্থা। একইসঙ্গে শিল্প, কৃষি ও অবকাঠামো খাতে উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। আজকের দিনের রাষ্ট্রিয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ছাড়াও প্রতিষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বর্তমানে বিডিবিএল), বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন, জীবন বিমা করপোরেশন; খাদ্যাভাব দূর করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এর মধ্যে রয়েছে কনজুমার্স সাপ্লাইজ করপোরেশন এবং টেক্সিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (ফরাসউদ্দিন, ২০১১)। মোট ৬৬০টি পরিত্যক্ত শিল্প ইউনিটের মধ্যে ২৯৫টি ইউনিট রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন করপোরেশনকে, ৩৪টি শিল্প ইউনিট সর্বোচ্চ দরে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর এবং ৪৬টি শিল্প ইউনিট সহজ শর্তে শ্রমিক ইউনিয়নকে যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য দেওয়া হয় (আহমদ, তা, ১৯৭৪)।

জাতীয়করণের আওতায় বিভিন্ন ধরনের শিল্পকারখানা মেরামত ও নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু সেসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় যোগ করেছিলেন নতুন মাত্রা। কর্মরত লাখ লাখ শ্রমিক-কর্মচারীর কল্যাণ নিশ্চিতকরণে NID-এর অধীনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ বস্ত্রকল করপোরেশন (বিটিএমসি), বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি), বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প করপোরেশন (বিসিআইসি), বাংলাদেশ স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (বিএসইসি), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস-সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান (ইমাম, ২০১১)। বঙ্গবন্ধুর সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুগার করপোরেশন। ঐ সময়েই যমুনা নদীর ওপরে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয় এবং প্রাথমিক সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও সংবিধানের ধারার আলোকে এবং এসব প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামোর অবলম্বনেই আধুনিক বাংলাদেশের ভিত্তি রচিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু একটি সমাজের আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক, অবকাঠামোগত এবং সব মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাকরণের যে মৌলিক ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন, তা-ই সোনার বাংলা বিনির্মাণের মূলমন্ত্র হিসেবে জাতিকে প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার পরে কেন্দ্রীয় বাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল শূন্য। গচ্ছিত স্বর্ণ হয়ে যায় লুণ্ঠিত। ব্যাংকগুলোতে কর্মরত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অধিকাংশ অবাঙালি থাকায় এবং তাদের কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারণে ব্যাংকগুলোতে দেখা দেয় দক্ষ জনবলের অভাব। শিল্প কারখানাগুলোতে একই সমস্যার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের সময় বন্ধ থাকায় অনেক যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে পড়ে। গুদামে স্পেয়ার পার্টস ও কাঁচামাল না থাকায় সরকারি দায়িত্বে প্রথমে প্রচেষ্টা চালানো হলেও ধীরে ধীরে ব্যক্তি উদ্যোগের সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন যে উদ্যোক্তারা হলেন একটি দেশের সম্পদ। এরা নিজেদের পুঁজি, ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকির মাধ্যমে একদিকে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে, অন্যদিকে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

করে দারিদ্র্য বিমোচনে সাহায্য করে। তাই তো স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ধীরে ধীরে ব্যক্তিখাত বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে মনোযোগী হন। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো শিল্প বিনিয়োগ নীতি ঘোষিত হয় ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে। ঐ নীতি অনুযায়ী ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের বাইরে রাখা হয়। জুলাই, ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ২৫ লাখ টাকা থেকে ৩ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। পরিত্যক্ত ১৩৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হিসেবে ৮২টি ব্যক্তি মালিকানায় ও ৫১টি কর্মচারী সমবায়ের কাছে বিক্রি করার ব্যবস্থা করাহয়। পাশাপাশি বেসরকারি খাতে কয়েকটি নতুন শিল্প গড়ে তোলার অনুমতি প্রদান করা হয়।

শিল্প ও শিক্ষার বিকাশ, অবকাঠামো, সেবা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা ও বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিল্পকারখানা, বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে আমদানিকৃত জ্বালানি তেল ব্যবহারের বিপরীতে গ্যাস ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এজন্য তিনি নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্রের সন্ধান ও পুরোনো গ্যাসক্ষেত্রের ওপর সরকারি মালিকানা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। প্রবর্তন করেছেন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৭৪। তার আগেই প্রতিষ্ঠা করেছেন গ্যাস অ্যান্ড অয়েল করপোরেশন। আগস্ট ৯, ১৯৭৫ তারিখে শুধু নামমাত্র টাকায় (৪৫ লাখ ব্রিটিশ পাউন্ড) ব্রিটিশ শেল পেট্রোলিয়াম থেকে পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণতা জাতীয় উন্নয়নের মূল ভিত্তিকে মজবুত ও সম্প্রসারিত করেছে।

স্বল্পায়তনের বাংলাদেশে দ্রুতবর্ধনশীল জনসংখ্যার জন্য খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও দারিদ্র বিমোচনের বিষয়টি বঙ্গবন্ধুকে সব সময় ভাবিত করত। তাই বঙ্গবন্ধু অর্থনীতির আকার বৃদ্ধি করার নতুন নতুন উপায় অন্বেষন করেছেন প্রতিনিয়ত। সমুদ্রসম্পদ আহরণ করে অর্থনীতিকে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করার চিন্তা তখন থেকেই। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে বঙ্গবন্ধু সমাজ-অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জনসংখ্যা শুমারি বঙ্গবন্ধুর সময়েই ১৯৭৪ সালে পরিচালিত হয়। তাতে করে নারী-পুরুষ বয়সভেদে গ্রাম ও শহরগুলোর জনসংখ্যার পরিমাণ, তাদের পেশা, শিক্ষা ও বিভিন্ন বিষয়ের পরিসংখ্যান ভবিষৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

বস্তুত, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা উপহার দিতে দিনে দিনে যেমন প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং জনগণকে সংগঠিত করেছেন, তেমনই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে বাংলার জনগণের মুখে হাসি ফোটাতে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনসহ এর ব্যাপক উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ করেছিলেন। এই কৌশলের মূলমন্ত্রই ছিল দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর তাদেরকে উন্নত জীবন উপহার দেওয়ার মানসিকতা থেকে উদ্ভূত ত্যাগ ও সাধনা। বঙ্গবন্ধু উন্নয়ন দর্শনের মর্মবস্তু এখানেই নিহিত।

অধ্যাপক আবুল বারকাত বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন, নেতৃত্ব, দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ,স্বাধীনতার আগে ও পরে সম্পাদিত কার্যাবলির ধরন ও পরিমাণ এবং সমাজে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনুধাবনে প্রক্ষেপণ করেছেন যে, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে পৃথিবীর অনেক দেশ এমনকি মালয়েশিয়ার চেয়েও জাতীয় আয় ও অন্যান্য সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে থাকত। মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটত আর সমাজের সর্বস্তরে বৈষম্য হ্রাস পেত অনেকগুণ (বারকাত, ২০১৫)।

সমাজ উন্নয়নে, অসমতা দূরীকরণে ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণে বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইউনেসকো ১১ ডিসেম্বর ২০২০-এ তাদের ২১০তম সেশনে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ফর ক্রিয়েটিভ ইকোনমি' প্রবর্তন করেছে। আশা করা যায়, এর ফলে একদিকে জাতিতে জাতিতে, দেশে-দেশে মানুষের মধ্যে ত্যাগ, সাধনা ও দেশপ্রেম জাগ্রত হবে, অন্যদিকে মুক্তিকামী মানুষ বঙ্গবন্ধুর দর্শনের আলোকে নিজেদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সমর্থ হবে। শেখ মুজিবুর রহমান শুধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একজন বাঙালির নামই নয়, এটি একটি আদর্শের নাম। ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ কালরাতে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করে বাংলাদেশে হয়তো জনগণের কল্যাণকামী সোনার বাংলা গড়ার প্রচেষ্টাকে সাময়িক স্থগিত করা গেছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শ শোষিত-বঞ্চিত নির্যাতিত অন্ন-বস্ত্র আর সহায়-সম্বলহীন মানুষকে মুক্তির প্রেরণা দেবে, সুন্দর জীবনের আলোকবর্তিকা রূপে আবির্ভূত হবে এবং মানুষে মানুষে বৈষম্য হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রেখে ত্যাগ ও সাধনার মহান ব্রতে সবাইকে উৎসাহিত করে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র সৃষ্টির তাগিদ দিয়ে যাবে। আর এই আদর্শের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যের হবে সফল পরিসমাপ্তি।

সোনার বাংলা গড়ার কার্যক্রম চলমান

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন তারই জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনা। তিনি বঙ্গবন্ধুর দর্শনে বলিয়ান, আদর্শে উজ্জীবিত ও লক্ষ্যে অবিচল। নিজের জীবনকে বঙ্গবন্ধুর মতোই নিবেদিত করেছেন বাংলার জনগণের কল্যাণে। তিনি সমাজ উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেন, জাতিকে স্বপ্ন দেখাতে ভালোবাসেন, স্বপ্ন পূরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সর্বোপরি পর্যায়ক্রমে পরিকল্পনা মাফিক বাস্তবায়ন করে চলেছেন। তিনি ক্ষমতাকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার না করে জনগণকে সেবা করার সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করেন। 'ক্ষমতা ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার নয় ক্ষমতা দেশ গড়ার সুযোগ, ক্ষমতা মানে দেশের মানুষের জন্য কাজ করা। ব্যক্তি স্বার্থ নয়, দেশের স্বার্থ বড়। দেশের মানুষের জন্য কাজ করার বড় সুযোগ। কীভাবে দেশকে গড়ে তোলা, মানুষের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে আসা, মানুষের জীবনের ন্যূনতম চাহিদা মিটাবে; অর্থাৎ– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে একটি সুন্দর সমাজ নির্মাণ, যেখানে মানুষ নিরাপদ চলবে, শান্তিতে ঘুমাবে।' (শেখ হাসিনা, ২০১৭)।

জাতির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিবেদিত নেতৃত্ব, উন্নয়ন পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন আজ বিশ্বে উদীয়মান দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিগণিত করেছে। বিগত বছরগুলোতে বড় অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিমাপে বাংলাদেশ ছিল অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল । অথচ স্বাধীনতার পরপরই তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। বাংলাদেশে উন্নয়নের গতিধারা বিশ্লেষণ করে ২০১৪ সালেই ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেন ডব্লিউ মোজেনা বলেছিলেন তলাবিহীন ঝুড়ি বলে বাংলাদেশকে করা কিসিঞ্জারের মন্তব্য ছিল ভুল। বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ, এখানকার জনগণ কঠোর পরিশ্রমী এবং বাংলাদেশ শিঘ্রই এশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী দেশে পরিণত হবে (risingbd.com, ১৫ February ২০১৪)। কিসিঞ্জারের মতো জাস্ট ফাল্যান্ড ও জে আর পারকিনসও বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে নাকচ করেছিলেন (Faalnd and Parkinson, ১৯৭৭) ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়, সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে' বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত ধারায়। আজ আর্থসামাজিক অনেক সূচকের মাপকাঠিতেই বাংলাদেশ বহু দেশ এমনকি পাকিস্তান ও ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। মানুষের গড় আয়ু, বয়স্ক শিক্ষার হার, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ খাওয়ার পানির প্রাপ্যতা, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি, মাথাপিছু জাতীয় আয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, রেমিট্যান্স প্রবাহ, ডিজিটালাইজেশন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও মানুষের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির আলোড়ন তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ এক অবাক বিস্ময়ের নাম। এর উল্লেখযোগ্য প্রধান কারণ হলো, জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত ও জনগণের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় পরিচালিত দেশের মানুষের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের প্রতি সংশয়হীন আস্থা। পদ্মা সেতু নির্মাণকাজ প্রায় সমাপ্ত, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ দ্রুত অগ্রগামী, অনেক বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে, মেট্রোরেল, উড়ালসেতু, কর্ণফুলী টানেল, গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণসহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বড় বড় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশকে বিশ্ব বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করছে। একই সঙ্গে 'আমার গ্রাম আমার শহর', 'সকলের জন্য বাসস্থান' ও জনগণের কল্যাণে গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ দেশবাসীর মধ্যে আস্থার ভিত্তিটিকে আরো শানিত করেছে। ব্লুমবার্গের মতে, করোনা মহামারিতেও সহনশীলতায় শীর্ষ ২০ দেশের একটি বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের জনগণের বৃহদংশ গ্রামে বাস করে, ফলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ কৃষি অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করার তাগিদে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন তাঁর অন্যতম উন্নয়ন দর্শন। এক্ষেত্রে তিনি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হারে নারীর ন্যূনতম অবদানের প্রেক্ষাপটে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবেই শিক্ষাকে দিয়েছেন অপরিসীম গুরুত্ব। এককথায়, সর্বক্ষেত্রে অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি আয়, সম্পদ ও তথ্যে নারীর সমঅধিকার নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম উপাদান হিসেবে মনে করেন তিনি। শিক্ষাকে বস্তুত তিনি সবসময় বিবেচনা করে আসছেন মানবসম্পদে বিনিয়োগ হিসেবে। শিক্ষাই অন্যতম হাতিয়ার, যার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, বৈষম্য হ্রাসকরণ ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায়।

অর্থনীতি বিকাশের অন্যতম উপকরণ হিসেবে দেখেছেন একটি শক্তিশালী বিদ্যুৎখাতের উপস্থিতি। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যুৎ ছাড়া আধুনিক জীবনমান নিশ্চিত করাসহ শিল্পোন্নয়ন, ডিজিটালাইজেশন ও যোগাযোগ পদ্ধতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। মার্চ ২০২১ সনের মধ্যে সারা দেশে শতভাগ বিদ্যুতের চাহিদাপূরণ শুধু শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের কারণে সম্ভবপর হচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতের পাশাপাশি অবকাঠামো খাতের বিস্তৃতিকেও তিনি দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও মানুষে-মানুষে আর অঞ্চলে-অঞ্চলে অসাম্য নিরসনের বাহন বলে মনে করেছেন। তাই তো দৃঢ় সংকল্পে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বড় প্রকল্প গ্রহণে বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ নিয়েছেন।

তাঁর অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শনের অন্যতম কৌশল হলো স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্যার দ্রুততম সময়ে সমাধানের ব্যবস্থা করা, মধ্যমেয়াদি কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্দিষ্ট খাতে স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজমান রাখা এবং দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপের

মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির গতিধারাকে ত্বরান্বিত করাসহ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি এবং যথাযথ পদক্ষেপের ফলে সাগরের বিস্তৃত এলাকায় আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার ফলে খুলে গেছে ব্লু-ইকোনমির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির আকার অনেক বড় করার সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ অর্থনীতির নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা। এলাকায় এলাকায় অসংখ্য অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার তাঁর যে দর্শন এবং সেই আলোকে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ তা অর্থনৈতিক বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনমান উন্নয়ন ও আর্থিক অসমতা দূরীকরণে রাখবে যুগান্তকারী ভূমিকা।

পুঁজিবাজারকে তিনি একটি শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করেন। সেজন্য দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের উৎস হিসেবে পুঁজিবাজারকে বিকশিত করার লক্ষ্যে বিগত বছরগুলোতে তাঁর নির্দেশে প্রয়োজনীয় আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সংস্কারসাধন করে একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ার ভিত্তি রচিত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হিসেবে তাঁর সুনাম বিশ্বজুড়ে। পরিবেশ সংরক্ষণ, ক্ষুধা-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অসমতা কমিয়ে আনা, শিক্ষার গুণমানের উন্নয়ন, নারী-পুরুষ সমতা আনয়ন ও উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করেছে– যোগ দিয়েছে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ সফল বাস্তবায়নের পথে। অব্যাহত অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্যামল প্রবৃদ্ধি ও তাঁর গৃহীত বিভিন্ন সামাজিক এবং বিকাশধর্মী পদক্ষেপের ফলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রাসমূহ ২০৩০ সালের আগেই অর্জিত হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে যেসব সূচক ও প্রপঞ্চের আন্তসম্পর্ক বিরাজমান, তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু অনুধাবন ও সেই আলোকে বিভিন্ন মেয়াদে কার্যক্রম পরিচালনাই শেখ হাসিনার অর্থনৈতিক দর্শনের অন্যতম উপাদান। মানুষে মানুষে বৈষম্য হ্রাসে তাঁর অভিপ্রায় এবং গ্রামীণ পরিবার থেকে শুরু করে সারা দেশের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে তাঁর নব নব উদ্যোগ তাঁকে নিয়ে গেছে সফল নেতৃত্বের শিখরে। ডেলটা পরিকল্পনা, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ও ব্লু-ইকোনমি উন্নয়নের ভিত্তি রচনার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের জন্য তিনি উন্মোচন করেছেন নতুন সম্ভাবনার দুয়ার। তাঁর অর্থনৈতিক দর্শনের আলোকে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত দেশে রূপান্তরিত হওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে, আর দেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

তথ্যপঞ্জি

১. আহমদ, তাজউদ্দীন (১৯৭৪), বাজেট ১৯৭৪-৭৫, বাজেট বক্তৃতা, সংসদ বিতর্ক, পার্ট-২,নম্বর-১১, ১৯ জুন।

২. ইমাম, এইচ টি (২০১১), স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু, ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু (নূহ-উল-আলম লেনিন সম্পাদিত), আওয়ামী লীগ, ঢাকা।

৩. কাদের, ওবায়দুল (২০১১), প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বঙ্গবন্ধু আমাদের রোল মডেল, ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু (নূহ-উল-আলম লেনিন সম্পাদিত), আওয়ামী লীগ, ঢাকা।

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (২০১৩) সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৫. ফরাসউদ্দিন, ড. মোহাম্মদ (২০১১), জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান: কেন তিনি প্রাসঙ্গিক কেন তিনি প্রেরণা, কেনই-বা তিনি বঙ্গবন্ধু, ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু (নূহ-উল-আলম লেনিন-সম্পাদিত), আওয়ামী লীগ, ঢাকা।

৬. বারকাত, আবুল (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে কোথায় পৌঁছাইত বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজ বিনির্মাণের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে, মুক্তিযুদ্ধ প্রকাশনা, ঢাকা।

৭. মুহিত, আবুল মাল আবদুল (২০১৭), মুক্তিযুদ্ধের রচনা সমগ্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৮. রহমান, শেখ মুজিবুর (১৯৬৬), আমাদের বাঁচার দাবি: ৬-দফা কর্মসূচি, ১৮ই মার্চ ১৯৬৬।

৯. রহমান, শেখ মুজিবুর (১৯৭০), সাধারণ নির্বাচনের আগে বেতারে প্রদত্ত ভাষণ, ভাষণ সমগ্র, ১৯৫৫-১৯৭৫ (এ কে আব্দুল মোমেন সম্পাদিত, ২০২০), নভেম্বর, ১৯৭০।

১০. রহমান, শেখ মুজিবুর (১৯৭১), প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত সদস্যের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ, ৯ই ফেব্রুয়ারি।

১১. রহমান, শেখ মুজিবুর (১৯৭১), রমনা রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ, ৭ই মার্চ।

১২. রহমান, শেখ মুজিবুর (১৯৭২), রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ, ৯ই মে।

১৩. রহমান, শেখ মুজিবুর (১৯৭২), সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ, ৭ই জুন।

১৪. রহমান, শেখ মুজিবুর (১৯৭৪),বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে ভাষণ, ১৮ই জানুয়ারি,

১৫. রহমান, শেখ মুজিবুর (১৯৭৪), জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ভাষণ, ১৫ই ডিসেম্বর।

১৬. রহমান, শেখ মুজিবুর (১৯৭৫), স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ, ২৬শে মার্চ।

১৭. রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২), অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

১৮. রহমান, ড. মো. মাহবুবর (২০১১), বঙ্গবন্ধুর শাসনামল, ১৯৭২-৭৫, ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু (নূহ-উল-আলম লেনিন সম্পাদিত), আওয়ামী লীগ, ঢাকা।

১৯. শেখ হাসিনা (২০২০), ভাষণ সমগ্র ১৯৫৫-১৯৭৫: শেখ মুজিবুর রহমান (এ কে আব্দুল মোমেন সম্পাদিত), ঢাকা।

২০. শেখ হাসিনা (২০১৭), নির্বাচিত প্রবন্ধ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

২১. সিদ্দিক, আ আ ম স আরেফিন (২০১১), বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন: বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু (নূহ-উল-আলম লেনিন সম্পাদিত), আওয়ামী লীগ, ঢাকা।

২২. হারুন-অর-রশিদ (২০২০), বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব: কী ও কেন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
২৩. Bala, S. K.(2020),Bangabandhu's Economic Philosophy and the Economic Policy MeasuresUndertaken Therefor: An Analytical Overview, Paper presented at an InternationalConference titled "Bangabandhu, His Times and Legacy: Society, Economy and StateFormation in Retrospect (1920-2020)", University of Barishal, 27-28 February 2020.
২৪. Government of the People's Republic of Bangladesh (1973), The First Five YearPlan, 1973-78, Planning Commission, Dhaka.
২৫. Rahman, Atiur (2018), Bangabandhu's thoughts on development: Focus on industrialization, The Financial Express, Dhaka, 14 August.
২৬. risingbd.com, 15 February 2014.
২৭. Tariq Ali (2017), What was Lenin Thinking?, New York Times, April3, 2017.

বঙ্গবন্ধুর শিল্পনীতি : উন্নত জাতিতে যুক্ত হওয়া একটি বিন্দু

ড. মোঃ মাসুদুর রহমান *
ড. মোহাম্মদ শরীয়ত উল্লাহ **

এই নিবন্ধটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টি-বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনা করেছে এবং পরবর্তী সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের নেতৃত্বে দূরদর্শী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কৌশলগত উদ্যোগের যোগসূত্র সন্ধানের প্রয়াস পেয়েছে। পরিসংখ্যানের পাশাপাশি তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, দেশীয় কাঁচামালের ব্যবহার করে গ্রাম অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে দেশের সব প্রান্তের উন্নয়ন ও রূপান্তরের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের বিকাশ ও প্রবৃদ্ধির দ্বারা বেসরকারি খাতকে শক্তিশালীকরণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার কার্যক্রম জোরদার করে। যার প্রতিফলনে দেখা যায়, Balance of Payment- এর ভারসাম্য রক্ষায় রপ্তানি শিল্পের এবং আমদানি বিকল্প পণ্যের উৎপাদনে জড়িত শিল্পসমূহের বিকাশে সরকারের গৃহীত কর্মসূচিসমূহ থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিল্প উন্নয়ন নীতিমালায় Heckscher-Ohlin এর Competitive Advantage তত্ত্বের প্রতিফলন সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে বঙ্গবন্ধু প্রদর্শিত পথে অসমাপ্ত অধ্যায় সুচারুরূপে সম্পন্ন করে তারই উত্তরসূরি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকার এবং দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ১৯৭০ সালে ৬৭ মার্কিন ডলার থেকে ২০২০ সালে প্রায় ২ হাজার মার্কিন

* ড. মোঃ মাসুদুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক এবং হাজী মুহম্মদ মুহসিন হলের প্রভোস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, যুক্তরাজ্যের সালফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ এবং যুক্তরাজ্যের ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০১৭ সাল থেকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি দেশি ও বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০, এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছেন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান। উল্লেখ্য যে, এসএমই ফাউন্ডেশনের ৭ম চেয়ারপার্সন হিসেবে অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান দায়িত্ব পালন করছেন।

** ড. মোহাম্মদ শরীয়ত উল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ বিভাগের অধ্যাপক এবং চেয়ারম্যান। এছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Centre for Trade and Investment (CTI) এর Senior Research Fellow হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি Bangabandhu International Research Centre UK (BIRCUK) এর Deputy Executive Director হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। অধ্যাপক শরীয়ত উল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে BBA এবং MBA ডিগ্রী লাভ করেন। ২০১৩ সালে তিনি জাপান সরকার প্রদত্ত The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) বৃত্তি পেয়ে জাপানের Ritsumeikan University থেকে PhD ডিগ্রী অর্জন করেন। অধ্যাপক শরীয়ত উল্লাহ ৩টি বই এবং দেশি ও বিদেশি জার্নালে ২৬টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

ডলারে উন্নীত করেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ১৯৭০ সালে ৮.৬ শতাংশ থেকে ২০২০ সালে তা ৩৫ শতাংশের বেশিতে উন্নীত হয়। অনুসন্ধানে আরো দেখা যায়, ১৯৬৪-৬৫ এবং ১৯৬৯-৭০ সময়কালে জিডিপিতে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদানের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.৬ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ এবং ২০১৯-২০ সময়কালে ৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি সুদীর্ঘ যাত্রা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'সোনার বাংলা' গড়ার দৃঢ়তায় জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে শুরু থেকেই এই সুদীর্ঘ পথের ভিত গঠনে তৎপর হন। উন্নয়নের এই দর্শন মূলত দুটি ভিশনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয় : (১) সামাজিক সমতা এবং (২) সমন্বিত উন্নয়ন (হোসেন ২০২০)। যার মূলে রয়েছে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের কারণে বাঙালি জাতির দুর্ভোগের করুণ ইতিহাস, যা ছিল জাতির পিতার দুঃস্বপ্ন। পাকিস্তান সরকারের আমলেই পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের উৎপাদিত উন্নত মানের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ৯০ শতাংশের বেশি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক পণ্য আমদানির দায় পরিশোধে ব্যয় হয়েছিল। এমনকি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বৃহৎ শিল্পগুলোকেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল (রেজা-২০২০)। এ ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিম্ন মাথাপিছু আয়, ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য এবং জিডিপিতে শিল্প খাতের নগণ্য অবদানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের দুর্ভোগ সুস্পষ্ট ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাক্কালে চলমান দমন-পীড়নে ব্যথিত বঙ্গবন্ধু সমতা এবং দেশ থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করায় ব্রতী হয়েই তাঁর বক্তৃতায় 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের কথা বলেছিলেন। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর 'উন্নয়ন দর্শন' বাংলাদেশের উন্নয়ন নীতিমালাসমূহে এবং কৌশলগত কাঠামোসমূহে প্রতিফলিত এবং বাস্তবায়িত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তাঁর সরকারের সময়কালে জিডিপিতে শিল্প খাতের অংশীদারিত্বের ধারাবাহিক বৃদ্ধির হার বজায় রয়েছে এবং এক দশক ধরে জিডিপির ৭ শতাংশের অধিক প্রবৃদ্ধিসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আজ সমাদৃত। তাই ২০২০ সালে বাংলাদেশের এই ঈর্ষণীয় উন্নয়নের পেছনে বঙ্গবন্ধুর শিল্প উন্নয়ন-বিষয়ক পরিকল্পনা এবং নীতিমালাসমূহের অবদান অনস্বীকার্য।

২. পদ্ধতি

এ প্রবন্ধটি ১৯৫৪ সালে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত নির্বাচনি ইশতেহার, ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত সরকারের গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) এবং শিল্পনীতি (১৯৭৩) পর্যালোচনাপূর্বক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা, সামগ্রিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩. ফলাফল ও বিশ্লেষণ

৩.১ জাতির পিতার শিল্প উন্নয়ন দর্শন

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্যনিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকল্পে শ্রমনির্ভর উৎপাদনশীল শিল্পায়নের পাশাপাশি কৃষির আধুনিকায়নে বঙ্গবন্ধু গুরুত্বারোপ করেন। তিনি শিল্প বিকাশের প্রক্রিয়াতে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, যা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে Heckscher-Ohlin এর Trade Competitiveness বিষয়ক Factor Endowment Theory- এর অন্যতম প্রধান নীতি হিসেবে বর্ণিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শিল্পায়ন এবং উন্নয়ন দর্শন পরিলক্ষিত হয় ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহারে, যার স্থপতি ছিলেন তিনি নিজেই। ২১ দফা ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধুর শিল্পোন্নয়নের এজেন্ডা নিম্নে চারটি দফায় পরিলক্ষিত হয়।

- পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসার জাতীয়করণ এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনয়ন, পাটচাষিদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং মুসলিম লীগ সরকারের আমলে পাট ও পাটজাত পণ্যের বাণিজ্যে দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিতকরণ।
- কৃষিতে সমবায় চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন এবং সম্পূর্ণ সরকারি সহায়তায় কুটিরশিল্পের বিকাশ।
- পূর্ব পাকিস্তানকে লবণ উৎপাদনে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসরে লবণ উৎপাদন শিল্প স্থাপন এবং মুসলিম লীগ সরকারের আমলে লবণ-দুর্নীতির তদন্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিতকরণ।
- কৃষি ও শিল্প খাতকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশকে স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি ILO কনভেনশন অনুসারে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণ।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় থাকাকালীনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের শিল্প বিকাশের বীজ রোপণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ১৯৫৪ সালের ১৫ই মে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বাণিজ্য, শিল্প ও দুর্নীতি দমন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। পুনরায় ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালের আতাউর রহমান খান গঠিত আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠনের পর মন্ত্রিত্ব লাভ করেন (আহমেদ, ২০০৪)। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় সংকল্প পরিলক্ষিত হয়েছিল যখন ষড়যন্ত্রকারীদের উসকানিতে উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দাঙ্গা চলাকালীন আদমজী জুট মিলসে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন (উদ্দিন, ২০২০)। ১৯৫৪ সালের ২৩শে মার্চ বাঙালি এবং অবাঙালি শ্রমিকদের এ দাঙ্গায় ৪০০ নিরীহ শ্রমিক নিহত হয়েছিলেন এবং প্রায় ১ হাজার শ্রমিক আহত হয়েছিলেন (আহমেদ, ২০০৪)।

৩.২। বঙ্গবন্ধু সরকারের শিল্পনীতি

'একটি পরিকল্পনা কেবল একটি প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক নথিই নয়, বরং একটি আর্থ-রাজনৈতিক দলিলও বটে, যাকে অবশ্যই জনগণকে উজ্জীবিত, সংহত এবং অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হতে হবে। একই সঙ্গে

জাতির দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনকে সুসংহত করবে।' [বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮), বাংলাদেশ]

'এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র শিল্পকে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে' [প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮), পৃষ্ঠা -২০৯]

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্প-কলকারখানার মালিকরা পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যায় এবং বাংলাদেশ সরকার তৎকালীন ৫১৭ কোটি টাকা সমমূল্যের ৩১৩টি শিল্পকারখানা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। জনগণের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার বাংলাদেশের চিনি, পাট, তুলা ও বস্ত্রশিল্প সেক্টরের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিগ্রহণ করে সেক্টরভিত্তিক করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পাট ও বস্ত্রশিল্প, চিনি, ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিপবিল্ডিং, পেপার ও বোর্ড, খাদ্য ও সংশ্লিষ্ট পণ্য, গ্যাস, তেল ও খনিজ, সার, রাসায়নিক দ্রব্য, ওষুধশিল্প (বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৩)। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে দেশি-বিদেশি মূলধন প্রবাহের ঘাটতি, আপামর জনসাধারণের নিম্ন শিক্ষার হার, নব্য স্বাধীন দেশের জনগণের উদ্যোক্তা হওয়ার অভিপ্রায়ের অভাব অনুধাবন করে জাতির পিতা রাষ্ট্র পরিচালিত শিল্পায়নের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বৃহৎ শিল্পসমূহে সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক সাহায্যের সঠিক ব্যবহারের ফলে দেশ গৌরবময় পর্যায়ে ফিরে আসে (রবিনসন, ১৯৭৩)। তবে এসব শিল্পে ব্যবস্থাপক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিশ্লেষক, দক্ষ হিসাবরক্ষক এবং বিপণন বিশেষজ্ঞের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে (বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৩)। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে একটি নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয় (রবিনসন, ১৯৭৩)। এ নতুন শিল্পনীতির কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

(১) অতি প্রয়োজনীয় কিছু শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগের বিধান,

(২) যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক শিল্প উদ্যোগে সরকারের কমপক্ষে ৫১ শতাংশ মালিকানার বিধান,

(৩) প্রস্তাবিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের বিধান।

স্বাধীনতার মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। এই পরিকল্পনা ছিল সরকারের উন্নয়ন উদ্যোগ এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনার যোগসূত্র। স্বাধীনতা উত্তরকালে পর্যাপ্ত জাতীয় ডাটাবেস এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঠিক দলিলের অভাব থাকা সত্ত্বেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা দেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর এক ঐতিহাসিক অবদানই ছিল না বরং তা বিশ্বের ইতিহাসেও ছিল এক বিরল দৃষ্টান্ত। এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেলটি ১৯৭৩-৭৮ সময়কালের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অতি প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কতগুলো কৌশলগত বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছিলেন:

(ক) দেশের টেকসই ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে শ্রমনিবিড় শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে শিল্পায়ন ছিল বঙ্গবন্ধুর জাতীয় উন্নয়ন স্বপ্নের প্রধান স্তম্ভ। প্রযুক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যেহেতু জনশক্তিই বাংলাদেশের মূল সম্পদ, তাই উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহে জনশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। ফলে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে শ্রমনিবিড় প্রযুক্তি গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(খ) দেশীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন ছিল এ শিল্প নীতির মূল স্তম্ভ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্ণিত আছে, 'আশা করা যাচ্ছে, শিল্পকে মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ততা, অধিকতর কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিসহ দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বনির্ভর হবে।' (বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ২০৮)।

(গ) স্বাধীনতা অর্জনের পরেই, বেসকারি খাতের দক্ষতা উন্নয়নকল্পে ও অভ্যন্তরীণ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চালন, ভৌগোলিক সুষম উন্নয়ন অর্জন ও জাতীয় অর্থনীতির রূপান্তরকে গতিশীল করার জন্য বঙ্গবন্ধু ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছিলেন, যা বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত রয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্ণিত, 'প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট অভ্যন্তরীণ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার শিল্পায়নের একটি প্রধান লক্ষ্য' (পৃষ্ঠা-২০৯)। কুটির ও হস্তশিল্প গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং শিল্পায়নের মূল ভিত্তি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগকেও একই সঙ্গে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছিল। গতিশীলতা, উদ্ভাবনীশক্তি এবং কৌশলগত নমনীয়তার জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মূল ইঞ্জিন হিসেবে স্বীকৃত, (পোর্টার ১৯৯০; আলি এট আল-২০১৪; ওইসিডি ২০১৫) যা বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলে পলিসিসমূহ এবং কৌশলগত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়।

(ঘ) মূলধনি যন্ত্রপাতি উৎপাদনশীল শিল্পের উন্নয়নের জন্য অন্যান্য শিল্পের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার্য পণ্যের উৎপাদন এবং ঐসকল খাতের সঙ্গে লিংকেজ স্থাপনের লক্ষ্যে হালকা প্রকৌশল শিল্পের প্রসারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল।

(ঙ) Balance of Payments-এর ভারসাম্য রক্ষার্থে রপ্তানিমুখী শিল্প এবং আমদানি বিকল্প শিল্পের বিকাশে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ছাড়া, সুযোগের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বৈচিত্রকরণে সচেষ্ট ছিল সরকার।

(চ) যেসব শিল্প দেশের কৃষি খাতের স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য অপরিহার্য, যেমন- সার, কীটনাশক, পাম্প, নলকূপ, স্প্রেয়ার এবং টিলার সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নয়নে সরকার সচেষ্ট ছিল। রবিনসন (১৯৭৩) উল্লেখ করেছিলেন যে, বাংলাদেশে ছোটো আকারের পাম্প এবং ইঞ্জিন, অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ, ছোটো নৌচলাচলের ব্যবহৃত ইঞ্জিন এবং বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। ২০২০ সালে, কৃষি খাতের আধুনিকীকরণের ফলে বাংলাদেশ কৃষি যন্ত্রপাতির ক্রমবর্ধমান চাহিদার মুখোমুখি, যা বঙ্গবন্ধু প্রায়

অর্ধশতাব্দী পূর্বেই তার দূরদৃষ্টির কারণে অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিকাশকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন।

(ছ) সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সমগ্র দেশে অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবহার করে শিল্প বিকাশের ওপর জোর দিয়েছিলেন। দেশের অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্প ইউনিট স্থাপন উৎসাহিত করার জন্য নীতিগত সহযোগিতা, প্রণোদনা এবং প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন।

(জ) Backward Linkage শিল্পের প্রসার ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত শিল্পনীতির আর একটি মেরুদন্ড। এ ধরনের সংযোগ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে শিল্পায়নের সুস্পষ্ট রূপরেখা বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতীয়মান। Backward Linkage ও অন্যান্য সহায়ক শিল্পের সহজলভ্যতা যে-কোনো দেশের শিল্পোন্নয়নের পথকে মসৃণ করে মর্মে মাইকেল পোর্টার (পোর্টার ১৯৯০ এবং ১৯৯৮) তার Trade Competitiveness তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন। পোর্টারের এই আধুনিক মডেলের সারমর্ম অর্ধশতাব্দী আগে বঙ্গবন্ধু প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'Growth through Linkage' ওপর গুরুত্বারোপের মাধ্যমেই সম্পূর্ণভাবে প্রতীয়মান হয়।

(ঝ) বিদ্যমান শিল্প কারখানাগুলোর আধুনিকায়ন এবং শিল্পায়নের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু গবেষণা এবং উন্নয়ন তথা R&D- এর প্রয়োজনীয়তাকে সঠিকরূপেই চিহ্নিত করেছিলেন। যার প্রতিফলন হিসেবে ১৯৭৩-৭৮ সালের জন্য প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেক্টরভিত্তিক বিনিয়োগ পরিকল্পনার ১.৭ শতাংশ অর্থ গবেষণা প্রতিষ্ঠান Feasibility Study ও অন্যান্য গবেষণার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল (বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৩)।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের শিল্পায়ন পরিকল্পনাকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে মোট সরকারি বিনিয়োগের ৬৯.৬৭ শতাংশ অর্থ পেট্রোকেমিক্যাল, লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্র খাত, খনিজ ও খনিজ সম্পদভিত্তিক শিল্প এবং রাসায়নিক শিল্প ও সংশ্লিষ্ট খাতের আধুনিকায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গবেষণার জন্য বিনিয়োগ করা হয়েছিল (বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৩)।

৩.৩ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের যোগসূত্রঃ

বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতিফলন এবং তাঁর স্বপ্নগুলো বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়েছে তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে, তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে বহু আর্থসামাজিক সূচকে বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় সাফল্যই দেশে ভৌগোলিকভাবে বিস্তৃত সমতাভিত্তিক টেকসই শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। নিম্নে টেবিল-১ ও টেবিল-২-এ আমরা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা'কে দেখতে পাই। অন্যদিকে স্বাধীনতার আগে এদেশের আপামর জনসাধারণের ওপর পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শোষণ, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্যই প্রমাণ করে। সরকারের যথোপযোগী উন্নয়ন নীতিমালা ও কার্যক্রম গত এক দশকে দেশের মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি অভাবনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

টেবিল ১ : মাথাপিছু আয় : ক্রমবর্ধমান বৈষম্য থেকে দ্রুত প্রবৃদ্ধি (১৯৪৯-২০২০)

বছর	মাথাপিছু আয় ১৯৫৯/৬০ মূল্যমানে মার্কিন ডলারে		বছর	বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় (বর্তমান মূল্যমানে মার্কিন ডলার
	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান		
১৯৪৯/৫০	৮১.৯১	১১০.৬২	২০১১-১২	৮৮০
১৯৫৯-৬০	৫৫.৪৪	৭৫.৮১	২০১৪-১৫	১,২৩৬
১৯৬৪-৬৫	৫৯.৮৫	৮৭.৯৯	২০১৭-১৮	১,৬৭৫
১৯৬৯-৭০	৬৭.৪১	১০৩.৩২	২০১৯-২০	১,৯৭০

সূত্র : রবিনসন (১৯৭৩), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০১৯-২০)

টেবিল-২ : বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার (১৯৪৯-২০১৯)

বছর	পূর্ব পাকিস্তানে জিডিপি প্রবৃদ্ধি	বছর	বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার
১৯৪৯/৫০ থেকে ১৯৫৯-৬০	২.২	২০১১-১২	৬.৫২
১৯৫৯-৬০ থেকে ১৯৬৪-৬৫	৪.৬	২০১৪-১৫	৬.৫৫
১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৯-৭০	৫.৪	২০১৮-১৯	৮.১৫

সূত্র : রবিনসন (১৯৭৩), বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ (২০২০)

সরকারি নীতিমালার সহায়ক ভূমিকায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যাত্রায় জিডিপিতে শিল্পের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর টেবিল-৩-এ দেখানো হয়েছে। ২০১৯-২০ সালে জিডিপিতে শিল্প খাতের অংশীদারিত্বের পরিমাণ ছিল ৩৫-৩৬ শতাংশ, অথচ এই অংশীদারিত্বের পরিমাণ ১৯৬৯-৭০ সালে ছিল মাত্র ৮.৬ শতাংশ। অতএব স্বাধীনতার পূর্বকালের তুলনায় স্বাধীনতা উত্তরকালে জিডিপিতে শিল্প খাতের অংশীদারিত্বের পরিমাণ প্রায় ৪.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকিস্তান শাসনামলে দুই দশকে জিডিপিতে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে ৪.৫% পয়েন্ট। তবে বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশের একই সূচকে প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ১০ শতাংশ পয়েন্ট। টেবিল-৪ অনুসারে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তান শাসনামলের তুলনায় গত এক দশকে দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ হয়েছে।

টেবিল-৩ : জিডিপিতে কৃষি ও শিল্পের অংশীদারিত্ব (১৯৪৯-২০২০)

বছর	শতকরা পশ্চিম পাকিস্তানের জিডিপি		বছর	শতকরা বাংলাদেশের জিডিপি	
	কৃষি	শিল্প		কৃষি	শিল্প
১৯৪৯-৫০	৬৪.৪	৪.১	২০০৫-০৬	১৯.১	২৫.৪০
১৯৫১-৫২	৬৩.২	৪.২	২০১০-১১	১৮.০১	২৭.৩৮
১৯৬১-৬২	৬৩.৫	৭.১	২০১৩-১৪	১৬.৫০	২৯.৫৫
১৯৬৪-৬৫	৫৬.৪	৬.৮	২০১৪-১৫	১৬.০	৩০.৪২
১৯৬৫-৬৬	৫৭.৪	৭.৭	২০১৫-১৬	১৫.৩৫	৩১.৫৪
১৯৬৬-৬৭	৫৪.১	৮.০	২০১৬-১৭	১৪.৭৪	৩২.৪২
১৯৬৭-৬৮	৫৪.৮	৮.০	২০১৭-১৮	১৪.২৩	৩৩.৬৬
১৯৬৮-৬৯	৫২.৮	৮.৫	২০১৮-১৯	১৩.৬৫	৩৫.০০
১৯৬৯-৭০	৫৩.০	৮.৬	২০১৯-২০	১৩.৩৫	৩৫.৩৬

সূত্র : রবিনসন (১৯৭৩), বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ (২০২০)

টেবিল-৪ : জিডিপিতে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান প্রবৃদ্ধি (১৯৪৯-২০২০)

বছর	স্থির মূল্যমানে (১৯৫৯-৬৯) পূর্ব পাকিস্তানের জিডিপিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার	বছর	স্থির মূল্যমানে (২০০৫-০৬) বাংলাদেশের জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর (কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে)-এর প্রবৃদ্ধির হার
১৯৪৯-৫২ থেকে ১৯৫৯-৬২ এর গড়	২.৪	২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪	৭.২
১৯৫৯-৬২ থেকে ১৯৬৪-৬৭ এর গড়	২.৬	২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-২০১৭	৯.৬
১৯৬৪-৬৭ থেকে ১৯৬৭-৭০ এর গড়	২.৬	২০১৭-১৮ থেকে ২০১৯-২০	৯.৩

সূত্র : রবিনসন (১৯৭৩), বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ (২০২০)

শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত ও শিল্পায়নকে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বেশ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- মোটর সাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতি ২০১৭
- জাহাজ ব্রেকিং এবং পুনর্ব্যবহার বিধি ২০১১
- বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮

- হস্তশিল্প নীতি ২০১৩
- রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার বিধিমালা ২০১৩
- ভোজ্য তেল, ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩
- জাতীয় লবণ নীতি ২০১১
- এসএমই নীতি ২০১৯

বর্তমান সরকার কর্তৃক বিভিন্ন শিল্পসহায়ক নীতিমালা ও কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে এলডিসি থেকে উন্নয়শীল দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের এবং তৈরি পোশাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও সফটওয়্যার, হস্তশিল্প, ওষুধ এবং আসবাবপত্রের মতো আরো কয়েকটি শিল্পে রপ্তানি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করা যায়, এসএমই নীতি ২০১৯ বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই এসএমই উন্নয়ন দ্বারা SDG এর ৯ নম্বর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশ থেকে বাংলাদেশ উন্নত দেশে রূপান্তরের স্বপ্ন বাস্তবায়নে মূল চালিকা শক্তি হবে।

উপসংহার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিল্প উন্নয়ন দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো : কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদের দক্ষ ব্যবহার দ্বারা রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসার ও প্রবৃদ্ধি। এ লক্ষ্যে তাঁর নীতিমালাসমূহের মূল উদ্দেশ্য ছিল কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সামাজিক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে স্বর্নিভর ও টেকসই 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলা। তাঁর বহুমাত্রিক প্রজ্ঞা জাতিকে সময়োপযোগী শিল্পোন্নয়নে প্রধানতম নিয়ামক-সহায়ক নীতিমালা উপহার দিয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অঙ্গণে সমাদৃত হয়েছে। যেমন– রবিনসন (১৯৭৩) বলেছেন, সাদা হাতি সমতুল্য বৃহৎ অত্যাধুনিক শিল্পকারখানা স্থাপন করার তুলনায় জুতা, বাইসাইকেল, মৃৎশিল্প এবং বস্ত্রশিল্পের মতো কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সংশ্লিষ্ট অতি স্বল্প মূলধন– অধিক আউটপুট রেশিও-সম্পন্ন শিল্পের দ্বারা শিল্পায়ন উত্তম। যেখানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্ভাবন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রধান ইঞ্জিন হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথেই বর্তমান সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ, ক্লাস্টারসমূহের উন্নয়ন এবং ভৌগোলিকভাবে ছড়িয়ে থাকা শিল্পকারখানার উন্নয়নের মাধ্যমে জিডিপিতে শিল্প খাতের অংশীদারিত্ব বাড়ানোর দ্বারা সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের এসএমই নীতিমালা-২০১৯-সহ দূরদর্শী পদক্ষেপ, নীতিগত, কাঠামোগত সহায়তা এক বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের শিল্প চালিত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথ প্রশস্ত করবে।

তথ্যসূত্র

- আহমেদ, এস। (২০০৪), বাংলাদেশ : অতীত ও বর্তমান, এপিএইচ প্রকাশনা কর্পোরেশন, ঢাকা।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০১৯-২০), জাতীয় অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যান [বিভিন্ন ইস্যু]।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা (২০২০), অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।
- বাংলাদেশ সরকার (১৯৭৩), প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।
- হুসেন, সৈয়দ আনোয়ার (২০২০), বঙ্গবন্ধুর বিকাশ দর্শন : পুনর্গঠন এবং ইক্যুইটির সাথে বৃদ্ধি। ইন: বঙ্গবন্ধু- দ্য পিপলস হিরো। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জিওবি, ঢাকা।
- পোর্টার মাইকেল (১৯৯০), প্রতিযোগিতামূলক অ্যাডভান্টেজ অব নেশনস, হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ, মার্চ-এপ্রিল ১৯৯০, ppl ৭৩-৯৩।
- পোর্টার মাইকেল (১৯৯৮), ক্লাস্টারস এবং প্রতিযোগিতার নতুন অর্থনীতি, হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৮।
- রেজা, এস। (২০২০), কাউকেই ছাড়ছেন না। ঢাকা ট্রিবিউন, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২০, অনলাইন। [এখানে উপলভ্য : [https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2020/01/09/leving-no-one-behind]
- রবিনসন এ। (১৯৭৩), বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিদেশের উন্নয়ন ইনস্টিটিউট লিমিটেড পার্সি স্ট্রিট।
- উদ্দিন, লাইলী (২০২০), কর্মবিরতিতে শত্রু এজেন্টস : পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৫৪ সালের আদমজী ও কারফুলি দাঙ্গার একটি মাইক্রোহিসটরি। ইন: মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ, খন্ড ৫৪, পার্ট ৬, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও এসএমই খাতের উন্নয়ন: একটি পর্যালোচনা

ড. মনজুর হোসেন *

ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন ছিল, তারই আলোকে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন-কে বিশ্লেষন করা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৫৭ সালে বিসিক প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন যা এ খাতের উন্নয়নে তাঁর বিশেষ আগ্রহের প্রতিফলন। ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প দেশের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য দূরীকরন এবং সর্বোপরি গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়নে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প আজ বাংলাদেশের উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।

গত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি বার্ষিক প্রায় ৭ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছর ২০১৯ সালে ৮.২ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ ২০২৪ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সব ধরনের মান অর্জন করেছে। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য ২০৩০ সালের একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করেছে। আর তাই অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও অভিযোজন সক্ষম প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম অর্থনৈতিক পরিবেশ প্রয়োজন। উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মূল হাতিয়ার শিল্পায়ন। অনেকের মতে বাংলাদেশের এ চমকপ্রদ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মূলে রয়েছে ক্রমবর্ধমান কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

গত দশকে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৭৪ শতাংশ হারে এবং সেবা খাতে হয়েছে ৭ শতাংশ হারে। বর্তমানে দেশের জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান আয় ৩১ শতাংশ, যা ১৯৯০ সালে ছিল ২১ শতাংশ। অন্যদিকে দেশের মোট জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান ৫০ শতাংশ। গত দুদশকে জিডিপিতে কৃষির অবদান ব্যাপকভাবে কমেছে। ১৯৯০ সালের ২৯ শতাংশ থেকে কমে ২০১৮-১৯ সালে প্রায় ১৩.৬৫ শতাংশে নেমে আসে। জিডিপিতে কৃষির অবদান হ্রাস পেলেও কৃষি এখনো কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় উৎস যা প্রায় ৪৮ শতাংশ (সারণি-১৫/১৬)। কৃষি কর্মসংস্থানের বড় উৎস হলেও প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হলো শিল্পখাত। কিন্তু দেশের বিশাল

---

* ড. মনজুর হোসেন দেশের স্বনামধন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর একজন গবেষণা পরিচালক। তিনি আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে জাপান থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। সামষ্টিক অর্থনীতি, উন্নয়ন অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তার গবেষণা ক্ষেত্র বিস্তৃত। দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তার কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি সরকারের বিভিন্ন পলিসি ডকুমেন্ট, যেমন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসএমই পলিসি ইত্যাদি প্রনয়নে ভূমিকা রেখেছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যেমন ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, আংকটাড, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে পরামর্শক হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। তাঁর বিশ বছরের অধিক গবেষণা অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তিনি ৫০ টিরও অধিক গবেষণা প্রবন্ধ এবং একাধিক বই রচনা করেছেন।

কৃষিখাতের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে নিয়োজনে শিল্প খাত তার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এখনো সক্ষম হয়নি। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এসএমই খাতকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো গেলে কৃষি খাতের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের বিকাশ ও প্রবৃদ্ধিতে সহায়তাকরণের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

দেশের মোট রপ্তানি আয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের বিরাট অবদান রয়েছে। তৈরি পোশাক খাত দেশের শিল্প খাতের মেরুদণ্ড হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশের বেশি তৈরি পোশাক খাত থেকে এসেছে। তৈরি পোশাক শিল্পের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, দেশের মোট তৈরি পোশাক কারখানার প্রায় ১০ শতাংশ কারখানা সাব-কনট্রাকটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ছোট ছোট কারখানার/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে (Bakht and Hossain, 2012; Bakht and Basher, 2014)। সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও দেশের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এসএমই পশ্চাৎসংযোগ (ব্যাকওয়ার্ড) সুবিধা প্রদান করছে দেশের তৈরি পোশাক কারখানাগুলোকে, যেমন বিভিন্ন ধরনের গার্মেন্ট এক্সেসরিজ (বোতাম, প্লাস্টিকস, প্যাকেজ ইত্যাদি) সরবরাহ করছে। তৈরি পোশাক শিল্প ও এসএমই এর মধ্যে কার্যকর সরবরাহ চেইন নেটওয়ার্ক সৃষ্টিতে তৈরি পোশাকের স্থিতিশীল রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির আরেকটা দিক হলো রেমিট্যান্স যা এসএমই খাতের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের বিপুল প্রবাহ লক্ষ করা যাচ্ছে। গত বেশ কয়েক বছর ধরে দেশে বছরে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা তার আশ-পাশে রেমিট্যান্স এসেছে, যা জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশ। দেশের ৮-১০ মিলিয়ন অভিবাসী শ্রমিকের বেশির ভাগই গ্রামে বাস করে এবং তারা উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগে আগ্রহী। তাই রেমিট্যান্সকে কিভাবে উৎপাদনমূলক বিনিয়োগে রূপান্তর করা যায় তা একটি নীতি নির্ধারণী বিষয়। সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি ও যথাযথ প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা গেলে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সকে এসএমই খাতের বিনিয়োগে প্রবাহিত করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকাণ্ডের প্রসারের সাথে সাথে বাংলাদেশে এখন টেক্সটাইল পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস, ফিনিশড লেদার, হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক, ফার্নিচার, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি শিল্পের প্রসার ঘটছে। বিশ্বে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় হলেও বিশ্ব রপ্তানি বাজারের মাত্র ৫ শতাংশ বাংলাদেশের দখলে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছর ২০১৯ সালে বিশ্ব রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি ৫৪.১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল যদিও কভিড-১৯ মহামারীর কারনে তা অর্জিত হয়নি। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আবার বিভিন্ন বিষয় যেমন রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, নতুন সম্ভাবনাময় বাজার অন্বেষণ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। এ পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এসএমই খাতের উন্নয়ন ও সম্ভাবনাময় আন্তর্জাতিক বাজারে এসএমই পণ্যের প্রবেশ বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ নীতি এজেন্ডা হতে পারে।

জাতীয় অর্থনীতিতে এসএমই খাতের প্রকৃত অবদান নিরূপণ করা বেশ কঠিন কারণ এসএমই শিল্প সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় উপাত্তের যেমন অভাব রয়েছে তেমনি এসএমই এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্নতা। বিভিন্ন নমুনা

জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান হিসাব করা হয়েছে। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (ADB 2015) পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুসারে জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান ২৫ শতাংশ। অন্যদিকে আইএফসি-ম্যাককিনসে (IFC 2013) অনুসারে এসএমই খাতের অবদান ২২.৫ শতাংশ। বিবিএস বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থা এখনো পর্যন্ত জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান হিসাব করার কোনো চেষ্টা করেনি। আইএফসি-ম্যাককিনসে সমীক্ষা হিসাব করে দেখেছে যে দেশের মোট রপ্তানিতে এসএমই খাতের অবদান ১১ শতাংশ। বিবিএস পরিচালিত সর্বশেষ অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩-এ প্রতিষ্ঠানের মূল্য সংযোজন ও আউটপুট সম্পর্কিত উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এসএমআই ২০১২ সমীক্ষার উপাত্ত ব্যবহার করে বলা যায় যে, ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজনে এসএমই খাতের অবদান হলো ৫২.৯ শতাংশ এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মসংস্থানে ৪০.৯ শতাংশ, যার মানে এসএমই হলো শ্রমের দক্ষ ব্যবহারকারী (Bakht and Basher, 2014)। অতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এসএমইতে কর্মী প্রতি মূল্য সংযোজন বেশি। তবে তথ্য-উপাত্তের অপ্রতুলতার কারণে প্রতিষ্ঠানের আকার ভেদে ম্যানুফ্যাকচারিং উৎপাদনশীলতার সাম্প্রতিক প্রবণতা নিরূপণ করা কঠিন।

বাংলাদেশে গত দুই দশকে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও দেশের শিল্প ভিত্তি এখনো শক্ত কাঠামোর উপর দাঁড়াতে পারেনি দুর্বল অবকাঠামো ও সহায়ক ব্যবসা পরিবেশের অনুপস্থিতির কারণে। এসব প্রতিবন্ধকতাকে বিবেচনায় নিয়ে এসএমই খাতের উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যথাযথ কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর তা বৃহৎ শিল্পের জন্য উৎপাদন নেটওয়ার্ক সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে দ্বিমত না থাকলেও এসএমই কর্মকাণ্ড বিষয়ে রিপোর্টিং ও পরিবীক্ষণের (মনিটরিং) জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকার কারণে অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান ও গুরুত্ব (জিডিপি, রপ্তানি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সূচকে) সঠিকভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে না।

২। এসএমই খাতের প্রবৃদ্ধির ধারা

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোতে এসএমই খাত প্রাধান্য বিস্তার করছে। অর্থনৈতিক শুমারী ২০১৩ অনুযায়ী, দেশের সকল অর্থনৈতিক ইউনিটের ৯৭ শতাংশের বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি (কুটিরশিল্প ও অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসহ) আকারের শিল্প ইউনিট। দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের সংখ্যা ৮ লাখ ৬৮ হাজার (২০১৩), যা ২০০১ ও ২০০৩ শুমারিতে উল্লেখিত সংখ্যার চেয়ে ৭৫ শতাংশ বেশি। দেশের মোট ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের মধ্যে এসএমই ইউনিটের সংখ্যা ৩৪ হাজার এবং এসব ইউনিটে প্রায় ৭০ লাখ জনবল নিয়োজিত রয়েছে। অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ অনুযায়ী, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের কর্মসংস্থানে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবদান যথাক্রমে ৭.৮, ১৬.২ ও ৬.৫ শতাংশ তবে অর্থনৈতিক শুমারিতে মূল্য সংযোজন সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত না থাকায় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের সার্বিক মূল্য সংযোজনে এসএমই খাতের অবদান পরিমাপ করা যায়নি। তবে এসমআই জরিপ ২০১২ এর উপাত্ত ব্যবহার করে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মোট মূল্য সংযোজনে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি অর্থনৈতিক ইউনিটের অবদান হিসাব করা হয়েছে যথাক্রমে ৫.৯, ২৩.৭ ও ২৩.৩ শতাংশ। এ থেকে দেখা বোঝা যায় যে, মাঝারি

আকারের শিল্প ইউনিটের বৃদ্ধি অন্য আকারের ইউনিটের মতো দ্রুতহারে হয়নি, যা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের সমস্যা বা জটিলতাকে নির্দেশ করে।

গত এক দশকে যেখানে কৃষিবহির্ভূত খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৯ শতাংশ হারে সেখানে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৮.২ শতাংশ হারে (বিবিএস: অর্থনৈতিক শুমারি, ২০০১/৩ ও ২০১৩)। দেশের মোট কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক ইউনিটের মাত্র ১০ শতাংশের সামান্য বেশি ম্যানুফ্যকচারিং সংশ্লিষ্ট এবং অবশিষ্ট ইউনিটগুলো ব্যবসা (ট্রেডিং) ও সেবা সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনৈতিক ইউনিটের মোট সংখ্যায় ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনটের অংশ কমছে, যা ব্যবসা ও ম্যানুফ্যাকচারিং বহির্ভূত সেবা খাতের দ্রুত বিকাশ ও বৃদ্ধিকেই নির্দেশ করে।

সারণি ১: এসএমই খাতের বর্তমান অবস্থা (২০১৩)

	অতি ক্ষুদ্র (মাইক্রো)	ক্ষুদ্র	মাঝারি	বৃহৎ	মোট এসএমই	মোট
	মোট নিয়োজিত কর্মী (১০-২৪)	মোট নিয়োজিত কর্মী (২৫-৯৯)	মোট নিয়োজিত কর্মী (১০০-২৪৯)	মোট নিয়োজিত কর্মী (২৫০+)		
অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০৪০০৭	৮৫৯৩১৮	৭১০৬	৫২৫০	৮৬৬৪২৪	৭৮১৮৫৬৫
মোট প্রতিষ্ঠানের অনুপাত (%)	১.৩৩	১০.৯৯	০.০৯	০.০৭	১১.০৮	১০০.০০
ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০৪০০৭	৩০৮৯০	২৯৯১	৩১২৩	৩৩৮৮১	৮৬৮২৪৪
ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানের অনুপাত (%)	১১.৯৮	৩.৫৬	০.৩৪	০.৩৬	৩.৯০	১০০.০০
মোট নিয়োজিত কর্মী	৫৫৮৮৭০	৬৬০০৬৮৫	৭০৬১১২	৩৪৬৬৮৫৬	৭৩০৬৭৯৭	২৪৫০০৮৫০
নিয়োজিত কর্মীদের অনুপাত (%)	২.২৮	২৬.৯৪	২.৮৮	১৪.১৫	২৯.৮২	১০০.০০

উৎস: বিবিএস:অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩। মোট সংখ্যায় কুটির শিল্পও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এসএমই খাতের প্রবৃদ্ধির ধারা বাংলাদেশের এসএমই খাতের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। ২০১৩ সালে দেশের কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা ছিল ৭.৮২ মিলিয়ন, যা ২০০১/৩ ও ১৯৮৬ সালে ছিল যথাক্রমে ৩.৭১ মিলিয়ন ও ২.১৭ মিলিয়ন। ১৯৮৬ সাল থেকে ২০০১/৩ সাল পর্যন্ত সময়কালে অর্থনৈতিক ইউনিটের বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৪ শতাংশ, যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১/৩ সাল হতে ২০১৩ সময়কালে ৭.২ শতাংশে উন্নীত হয়। ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের সংখ্যা ২০০১/৩ সালের শুমারিতে ছিল ৪ লাখ ৫০ হাজার, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালের শুমারিতে ৮ লাখ ৬৮ হাজারে উন্নীত হয় অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৮.২ শতাংশ। কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক ইউনিটের মোট সংখ্যায় ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের অংশ ১৯৮৬ সালের ২৪.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০০১/৩ সালে ১২.১ শতাংশ ও ২০১৩ সালে ১১.১ শতাংশে নেমে আসে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এসএমই খাতে ব্যবসা ও ম্যানুফ্যাকচারিং বহির্ভূত কর্মকাণ্ড প্রাধান্য বিস্তার করছে যদিও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের তুলনায় ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকাণ্ড সামান্য দ্রুত হারে (৮.২ বনাম ৭.৯ শতাংশ) বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্ত-শুমারি সময়কালে কৃষি বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের প্রবৃদ্ধি গ্রাম এলাকার (৭.৫৯ শতাংশ) চেয়ে শহর এলাকায় সামান্য বেশি (৮.৪ শতাংশ)। গত আন্ত-শুমারি সময়কালে গ্রাম এলাকায় কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা বার্ষিক কম্পাউন্ড ৮.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়, যার ফলে মোট অর্থনৈতিক ইউনিটে কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা ২০০১ সালের ৬২.৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে ৭১.৫ শতাংশ হয়।

এসএমই এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে মতানৈক্য থাকায় অর্থনৈতিক শুমারির উপাত্তের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যথাযথ তুলনা করা কঠিন । তবে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মোটামুটি একটি তুলনা করা যেতে পারে (সারণি- ২)। তুলনা থেকে দেখা যায়, ইত্যবছরে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ২: এসএমই খাতের গঠন কাঠামো (স্থায়ী অর্থনৈতিক ইউনিটের মোট সংখ্যার %)

	২০০১/০৩			২০১৩		
	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট
অতি ক্ষুদ্র (মাইক্রো)	৬১.৭	৩৫.৯	৯৭.৩	৫৭.৩	২৫.১	৮২.৭
ক্ষুদ্র	১.১	১.৫	২.৪	৭.৬	৯.৪	১৭.০
মাঝারি	০.০৪	০.০৮	০.১১	০.০৭	০.০৯	০.১৬
বৃহৎ	০.০৩	০.১	০.১২	০.০৩	০.০৮	০.১২
মোট	৬২.৬০	৩৭.৪০	১০০.০০	৬৫.০	৩৫.০	১০০.০০

টীকা: দুটো অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ব্যবহৃত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞায় ভিন্নতা থাকায় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ধরন সম্পর্কিত সংখ্যার তুলনা করা হয়নি।

এসএমই খাতের খাতভিত্তিক গঠন থেকে দেখা যায়, আন্ত-শুমারি সময়কালে (২০১৩-২০০১/৩) যেখানে এসএমই ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের সংখ্যা সামান্য কমেছে সেখানে ব্যবসা ও সেবা ইউনিটের অংশ বেড়েছে

উল্লেখযোগ্য হারে। এ সময়ের মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের ইউনিটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক শুমারিতে প্রাসঙ্গিক উপাত্ত সংগ্রহ না করার কারণে মূল্য সংযোজনে এসএমই ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের অবদান এসএমআই ২০১২ জরিপের উপাত্ত থেকে পরিমাপ করা হয়েছে। জিডিপিতে এসএমই এর খাতভিত্তিক অবদান পরিমাপ করা আরও কঠিন। ২০০৬/৭ সালে ৬টি বুস্টার খাতের উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় সার্বিক মূল্য সংযোজনের হিসাব দেয়া হয়েছে। দেখা গেছে, সার্বিক মূল্য সংযোজনে সর্বোচ্চ অবদান হচ্ছে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, লেদার ও ফুটওয়্যার এবং ডিজাইনার দ্রব্যাদি খাতের। এসব উচ্চ মূল্য সংযোজনকারী খাতের প্রসারের জন্য খাতভিত্তিক নীতি প্রণয়নের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

সারণি ৩: ৬টি খাতে সার্বিক মূল্য সংযোজন এবং প্রতিষ্ঠান প্রতি কর্মসংস্থান:২০০৬/০৭

	অতি ক্ষুদ্র		ক্ষুদ্র		মাঝারি		বৃহৎ	
	সার্বিক মূল্য সংযোজন	প্রতি প্রতিষ্টানে নিয়োজন (সংখ্যা)	সার্বিক মূল্য সংযোজন	প্রতি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজন (সংখ্যা)	সার্বিক মূল্য সংযোজন	প্রতি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজন (সংখ্যা)	সার্বিক মূল্য সংযোজন	প্রতি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজন (সংখ্যা)
কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ	৪০.৪	৫.৯	৪৪.৩	২৩.৬	৫২.২	৭০.৬	৫১	২৫৪.২
লেদার ও ফুটওয়্যার	৪৭.৩৩	৫.৯	২২.৫৯	২১.৮	৪৫.৩২	৬৯.৭	৫৬.৯৫	৬২০.৮
ডিজাইনার দ্রব্যাদি	৭৪.১	৬.৫	৫৯.৪	৩৫.৭	৪৬.৮	৭১.৯	৬০.০	৬৬৬.৭
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস	৩৮.৮২	৬.৩	৩৬.৭৯	২৩.৯	২৯.৬১	৬৫.৮	৩৪.৬১	১৭০.৩
প্লাস্টিক	৩২.০	৫.৬	৩২.৪	২১.০	৩০.৪	৭৫.৮	৩৫.০	২৬১.২
হালকা প্রকৌশল	৫৮.৪	৪.৬	৩৪.৮	১৯.১	৩৬.৭৪	৭৪.৪	৩১.০৩	১৯৬.৯

উৎস: ৬টি বুস্টার খাত শীর্ষক সমীক্ষা, ২০০৭, এসএমই ফাউন্ডেশন।

বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের একটি বড় উৎস হলো এসএমই খাত। প্রায় ২৪ মিলিয়ন লোক এখাতে নিয়োজিত রয়েছে (বিভিন্ন হিসাবে অবশ্য তারতম্য রয়েছে)। এদের প্রায় ২৩ শতাংশ আবার ম্যানুফ্যাকচারিং এসএমইতে নিয়োজিত। দেখা গেছে, কর্মসংস্থান বেশি হয়েছে মূলত সেসব প্রতিষ্ঠানে যেখানে ১০-৪৯ জন এবং ৫০-৯৯ জন কর্মী রয়েছে। তাই অন্যান্য গ্রুপের চাইতে এ দুটি গ্রুপ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের গতিশীলতা আনয়ন করেছে।

সারণি ৪: ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের অবস্থা, ২০১৩

	অতি ক্ষুদ্র (১০-২৪ জন কর্মী)	ক্ষুদ্র (২৫-৯৯ জন কর্মী)	মাঝারি (১০০-২৪৯) জন কর্মী	বৃহৎ (২৫০ বা ততোধিক) কর্মী	মোট এসএমই	মোট
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০৪০০৭	৩০৮৯০	২৯৯১	৩১২৩	৩৩৮৮১	৮৬৮২৪৪
মোট প্রতিষ্ঠানের অনুপাত (%)	১১.৯৮	৩.৫৬	০.৩৪	০.৩৬	৩.৯০	১০০.০০
মোট নিয়োজিত কর্মী	৫৫৮৮৭০	১১৬৫৫৬৪	৪৭০৩৪৩	২৯১৬৩৬০	১৬৩৫৯০৭	৭১৮৩৪৪৬
মোট নিয়োজিত কর্মীর অনুপাত (%)	৭.৭৮	১৬.২৩	৬.৫৫	৪০.৬০	২২.৭৭	১০০.০০
সার্বিক মূল্য সংযোজন[২] (মিলিয়ন টাকা)	৯২,০৯২ (৫.৯)	৩৬৯,৯৭৪ (২৩.৭)	৩৬৩,৬৪৬ (২৩.৩)	৭৩৭,২৩৫ (৪৭.২)		১৫৬২,৯৪৭ (১০০)
কর্মী প্রতি মূল্য সংযোজন ('০০০ টাকা)[২]	৩৩৯	৫০১	৩৪৯	২৪৯		৩১২

উৎস: *বিবিএস, অর্থনৈতিক শুমারি প্রতিবেদন ২০১৩*

এসএমই ক্লাস্টার ও বিসিক শিল্প নগরী

বাংলাদেশের এসএমই খাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এসএমইভিত্তিক শিল্প ক্লাস্টার গড়ে উঠেছে। এসএমই ফাউন্ডেশন পরিচালিত এক সমীক্ষায় (এসএমইএফ, ২০১৩) সারা দেশে প্রায় ১৭৭টি এসএমই ক্লাস্টার শনাক্ত করা হয় যেখানে ৬৯ হাজারের বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে (সারণি- ৫) । ক্লাস্টার বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে, জোট গঠন, ক্লাস্টারিং ও নেটওয়ার্কিং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সাথে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশপাশি তাদের বিকাশেও সহায়তা করে। প্রতিষ্ঠানসমূহ একজোট হয়ে কাজ করলে যেমন কালেকটিভ ইফিসিয়েন্সির সুবিধা লাভ করা যায় তেমনি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যুক্ত হওয়া যায়। এছাড়া দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশে সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে থাকে। সুতরাং ক্লাস্টারসমূহ চিহ্নিত করার পর সেগুলোর বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতি নিরূপণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

সারণি ৫: বাংলাদেশের এসএমই ক্লাস্টারের বিবরণ, ২০১৩

বাংলাদেশের মোট ক্লাস্টারের সংখ্যা	১৭৭
এসএমই বুস্টার খাতসমূহের আওতাধীন ক্লাস্টারের সংখ্যা	১২৯
বুস্টার এসএমই খাত বহির্ভূত ক্লাস্টারের সংখ্যা	৪৮
প্রতিষ্ঠান/ভেনচারের মোট সংখ্যা (আনুমানিক)	৬৯,৯০২
মোট বার্ষিক টার্ণওভার (মিলিয়ন টাকায়) [আনুমানিক]	২৯৫১৫০.৬৬
মোট কর্মী সংখ্যা (আনুমানিক)	১,৯৩৭,৮০৯
-পুরুষ	*১,৪৩৩,৯৭৯ (৭৪%)*
-মহিলা	*৫০৩,৮৩০ (২৬%)*
প্রতিষ্ঠান প্রতি গড় কর্মীর সংখ্যা	২৮
ক্লাস্টার প্রতি কর্মীর সংখ্যা	১০,৯৪৮
ক্লাস্টার প্রতি প্রতিষ্ঠানের গড় সংখ্যা	৩৯৪

টীকা: প্রতিষ্ঠান ও কর্মী সংখ্যা এবং টার্ণওভারের অংক কেবল শনাক্তকৃত ক্লাস্টারসমূহের জন্য প্রযোজ্য।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন যার মাধ্যমে তিনি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প তথা দেশে শিল্পায়নের মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়নে একটি বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিয়েছিলেন[১]।

দেশের সকল প্রশাসনিক জেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের সরকারি নীতির আলোকে এ পর্যন্ত দেশের ৬টি জেলা বাদে (বান্দরবন, বরগুনা, চুয়াডাঙ্গা, ঝালকাঠি, মাগুড়া ও নড়াইল[২]) ৫৮টি জেলায় ৭৪টি শিল্পনগরী স্থাপিত হয়েছে। বিসিকের একটি অন্যতম কাজ হলো দেশের বিভিন্ন এলাকায় শিল্পনগরী স্থাপন ও সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা। বিসিক শিল্পনগরীর শিল্পোদ্যোক্তারা বিবিধ ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকে যেমন হ্রাসকৃত হারে প্লট বরাদ্দ, কর অবকাশ, অবকাঠামোগত সুবিধা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়তা। এসব শিল্পনগরী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী এলাকার দারিদ্র্য নিরসনে মূল্যবান অবদান রাখছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদের সেবা প্রদানের জন্য ঢাকায় বিসিকের প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ৬৪টি জেলা কার্যালয় (শিল্প সহায়ক কেন্দ্র), ৭৪[৩]টি শিল্পনগরী কার্যালয় এবং ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে।

---

১. বঙ্গবন্ধু ১৯৫৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৭ সালের ৩০ মে পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বানিজ্য, শ্রম, দূর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তিনি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প আইন, ১৯৫৭ প্রনয়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। এ সময়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করেন যা বর্তমানে বিসিক নামে পরিচিত।

২. বিসিক-এমআইএস প্রতিবেদন ২০১৭।

৩. বিসিক-এমআইএস প্রতিবেদন (২০১৮ ফেব্রুয়ারি) অনুসারে ২টি নতুন শিল্পনগরী স্থাপিত হয়েছে-একটি পাবনায় (২০১৬ সালে) ও অন্যটি চট্টগ্রামের মিরসরাই (২০১৭ সালে)। পাবনা-২ শিল্পনগরীতে মোট ৮১টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়। ২৩টি প্লটে নির্মাণ কাজ শুরু হলেও কোনোটিতেই উৎপাদন শুরু হয়নি।

জাতীয় অর্থনীতিতে ও স্থানীয় টারশিয়ারী খাতে বিসিক শিল্পনগরীগুলোর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এসব শিল্পনগরী ৫ সহস্রাধিক শিল্প ইউনিটের জন্য স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান, কাঁচামাল ও স্থানীয় নিচি বাজার থেকে সুবিধা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। শিল্পনগরীগুলোর মধ্যে ৪টি স্থাপন করা হয়েছে কিছু বিশেষ খাতের প্রসারের জন্য যেমন জামদানী, হোসিয়ারী, চামড়া ও ইলেকট্রনিক। ২০১৬-১৭ সালে শিল্পনগরীগুলোর মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৫২.৬২২ মিলিয়ন টাকা, যা দেশের মোট শিল্প উৎপাদনের ১১.৭ শতাংশ এবং মোট ম্যানুফ্যাকচারিং উৎপাদনের ১৮.৭ শতাংশ। বিসিক শিল্পনগরীগুলো থেকে মোট রপ্তানির প্রায় ৯.৫ শতাংশ এবং ম্যানুফ্যাকচারিং রপ্তানির ১০ শতাংশ আসে। শিল্পনগরীগুলো এ পর্যন্ত ০.৫৬৪ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে, যা মোট ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মসংস্থানের ৮.৮ শতাংশ এবং মোট এসএমই কর্মসংস্থানের ২১.৪ শতাংশ। জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সার্বিক মূল্য সংযোজন হিসাব করা হয়েছে ১০৫,৫৫৪ মিলিয়ন টাকা, যা এসএমই খাতের সার্বিক মূল্য সংযোজনের ৬.৩৫ শতাংশ।

দেশের স্থানীয় টারশিয়ারী খাতের উপর শিল্পনগরীগুলোর গুরুত্বপূর্ণ স্পিলওভার প্রভাব রয়েছে। দেখা গেছে, শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন ধরনের পশ্চাৎ সংযোগ ও সম্মুখ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাজার ও গ্রোথ সেন্টার, দোকান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ক্লিনিক, ড্রাগ স্টোর ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এছাড়া বাড়ী ও জমির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিসিক শিল্পনগরীর উন্নয়ন স্থানীয় অর্থনীতির ওপর ইতিবাচক স্পিলওভার প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

বিসিক শিল্পনগরীতে চালু প্রতিষ্ঠানসমূহের পারফরমেন্স বিশ্লেষণে দেখা গেছে, শিল্পনগরীর অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের পারফরমেন্স জাতীয় পর্যায়ের এসএমই পারফরমেন্সের সাথে তুলনীয়। অনেক ক্ষেত্রে শিল্পনগরীর বাহিরে অবস্থিত শিল্প ইউনিটের চেয়ে বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত শিল্প ইউনিটের পারফরমেন্স অনেক ভালো। এ ধরনের পারফরমেন্সের কারণ হলো ব্যবসার এগলোমেরেশন (agglomeration), যা ঝুঁকি ও রিটার্ণ শেয়ার করার নানা সুবিধা প্রদান করে।

৩। এসএমই খাতের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা: অর্থায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের এসএমই খাতভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত যেসব বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে সেগুলো হলো: প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অভাব, কার্যকরী মূলধনের অপর্যাপ্ততা, প্রযুক্তির নিম্নমান, নিম্ন উৎপাদনশীলতা, পণ্য বিপণন সুবিধাদির অভাব, বাজার প্রবেশের সমস্যা ইত্যাদি (Islam, Zohir and Hossain 2009)। অধিকন্তু অনির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, দুর্বল অবকাঠামো, কমপ্লায়েন্স ইস্যু, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা ইত্যাদি এসএমই খাতের উন্নয়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন গবেষনায় দেখা গিয়েছে যে, অর্থায়নের সমস্যা এসএমই খাতের উন্নয়নের বড় প্রতিবন্ধক। তাই অর্থায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে এ সেকশনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১। এসএমই অর্থায়ন চিত্র

২০১৩ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রকল্প "INSPIRED" ১২০০ (INSPIRED 2013) ম্যানুফ্যাকচারিং এসএমই এর ওপর এক জরিপ পরিচালনা করে। উক্ত জরিপে দেখা গেছে, ৬৮.৬ শতাংশ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এবং ৪৪.৭ শতাংশ মাঝারি প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। অপর্যাপ্ত অর্থায়ন

সুবিধা আরও প্রকট হয় উচ্চ সুদের হার, জামানত প্রদানের কঠোর বিধান, ঋণগ্রহীতাদের অধিকারের অপর্যাপ্ত সুরক্ষা ইত্যাদি কারণে। ঋণ ঝুঁকি নিশ্চয়তা স্কীমসমূহ (জামানতবিহীন অর্থায়ন প্রসারের জন্য অপরিহার্য) কার্যকর নয়। বিকল্প অর্থায়ন সুবিধা বৃদ্ধি এবং আর্থিক বাজারকে বহুমুখীকরণের (ক্ষুদ্রঋণ থেকে শুরু করে লিজিং, ফ্যাকটরিং, ভেনচার ক্যাপিটাল, ইক্যুইটি ফান্ড ইত্যাদি) জন্য আইনি কাঠামো/নীতি পদক্ষেপের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট ঋণ পোর্টফোলিওর ১৬-১৯ শতাংশ এমএসএমইর দখলে (সারণি- ৬)। এসএমই খাতে বর্তমানে ঋণ সুবিধা দেয়া হচ্ছে মূলত বংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ ও বিশেষ নির্দেশনার কারণে। এসএমই ঋণের এরূপ প্রবাহ টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ব্যাপী অব্যাহত থাকা অপরিহার্য। এসএমই খাতকে অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে বেসিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলেও বেসিক ব্যাংক সে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। এজন্য এসএমই অর্থায়নে আলাদা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ওপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

সারণি ৬: বাংলাদেশে এসএমই অর্থায়ন চিত্র

বছর	ব্যাংক খাত কর্তৃক প্রদত্ত মোট ঋণ (বিলিয়ন টাকা	এসএমই খাতে প্রদত্ত মোট ঋণ (বিলিয়ন টাকা)	মোট ঋণের শতাংশ হিসেবে এসএমই ঋণ
২০১০	৩১২২.১	৫১৮.৪৯১	১৬.৬১
২০১১	৩৭৯২.৫	৫২০.৭৩৭	১৩.৭৩
২০১২	৪২৬১.৫	৬৮২.৬২৯	১৬.০২
২০১৩	৪৭১৮.২	৮৫৩.২৩৩	১৮.০৮
২০১৪	৫১৪৭.২	৯৮০.৩৩	১৯.০৫
২০১৫	৬৫০৬.৪	১১০২.৮৭	১৬.৯৫
২০১৬	৭৫২৯.৮	১২৯০.৬৮	১৭.১৩
২০১৭	৮৮০৭.৫	১৫৫৭.৮৫	১৭.৭৬
২০১৮	৯৮৫৪.৪	১৫৫৮.০৯	১৫.৮১

উৎস: *বাংলাদেশ ব্যাংক।*

বাংলাদেশ ব্যাংক এর পুন:অর্থায়ন কর্মসূচি

বাংলাদেশ ব্যাংক তার নির্দেশিত ঋণ কর্মসূচি ও আর্থিক সেবাদির মাধ্যমে এসএমই সেবা প্রদানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে উদ্বুদ্ধকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এসব সেবার অন্তর্ভুক্ত হলো বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদান ব্যবহার করে পুন:অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যাংকগুলোতে আলাদা ডেস্ক চালু ও এসএমই সার্ভিস সেন্টার খোলা এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সেবা সুবিধা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন পরিবীক্ষণ, নীতি প্রণয়ন ও ঋণ সুবিধা প্রদানে সহায়তা করতে বাংলাদেশ ব্যাংকে এসএমই ও বিশেষ কর্মসূচি বিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগ চালু করা হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণের নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে

দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। এসএমই পুন:অর্থায়ন কর্মসূচির অবস্থা সারণি ৭-এ দেখানো হয়েছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণসীমা ৫০ হাজার টাকা থেকে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত নির্ধারিত করা হয়েছে। মোট এসএমই ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার কমপক্ষে ৪০ শতাংশ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য এবং অবশিষ্ট ৬০ শতাংশ মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আলাদা নারী উদ্যোক্তা ডেস্ক স্থাপনের (প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত জনবল এবং আলাদা ডেস্কের প্রধান হিসেবে সম্ভব হলে নারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানসহ) নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে নারী উদ্যোক্তাদের ২৫ লাখ (২৫,০০,০০০) টাকা পর্যন্ত ঋণ অনুমোদন দিতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রুপ বা দলীয় জামানত/সামাজিক জামানত গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। মোট কথা মোট এসএমই ঋণের ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের দেয়া হবে। প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সেক্টর/সাবসেক্টর ভিত্তিতে এসএমই ঋণের উপর সুদের হার নির্ধারণের নির্দেশ দেয়া হয়। নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে সুদের হার হবে ব্যাংক রেট+৫%, তবে ১০% এর বেশি নয়।

সারণি ৭: এসএমই পুন:অর্থায়ন কর্মসূচির অবস্থা (জুন ২০১৫)

বছর	পুন:অর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকা)				পুন:অর্থায়ন সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			
	ওয়ার্কিং মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট	শিল্প ঋণ	বাণিজ্যিক ঋণ	সেবা	মোট
২০১০	৪৪৪.২২	৮০০.৯০	৪০২.৮৮	১৬৪৮.০০	৪৫৮৫	১০০৫৩	২৫৯৭	১৭২৩৫
২০১১	৪৯৮.৯৩	৯৭৪.৯০	৪৫৬.৮৩	১৯৩০.৬৬	৬০৭৩	১২১৬৩	২৯৫৫	২১১৯১
২০১২	৬২০.২৯	১৪৭০.৪	৫৪৪.৪৮	২৭৩৫.০১	১০১৯২	১৮৩০০	৪৯৭৪	৩৩৪৫৬
২০১৩	৬৭৮.৮৯	১৫৬৪.৩৭	৬৪৫.৬১	২৮৮৮.৮৮	১১৮৩৭	১৯২৫৭	৫৩৮৯	৩৬৪৮৩
২০১৪	৭৭৭.৭১	১৮৮৯.৮৩	৯২১.৩৯	৩৫৮৮.৯৩	১৪৫৮৬	২১৫৪৭	৬৫২৮	৪২৬৬১
২০১৫ (২০১৫ এর জুন শেষ নাগাদ)	১০৪৯.০৮	২২৪৬.৬৩	১৫০৭.৮৯	৪৮০৩.৬	১৭৪৭৬	২৩৩২১	৬৯১৩	৪৭৭১০
২০২০ (জুন শেষ নাগাদ)	১০৩৬.৩৯	২৫১৩.১৯	৮৯৪.১৯	৪৪৪৩.৭৬	১৩৬৪৪	১৯৯৮৫	৫৯২০	৩৯৫৪৯

উৎস: *বাংলাদেশ ব্যাংক।*

এসএমই ফাউন্ডেশন এর ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচি:

ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচি পরিচালনা এসএমই ফাউন্ডেশনের একটি অন্যতম কার্যক্রম। এসএমই খাতে জামানত ছাড়াই সিঙ্গেল ডিজিট সুদে ঋণ দেয়ার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশনের নিজস্ব তহবিল হতে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তহবিল সংকটের কারনে শুধুমাত্র

ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ তহবিল হতে ঋন প্রদান করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৭ সালে ৬০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় ১২১৩ টি ফার্মের মধ্যে (সারণি-৮)

বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে এ ঋণ কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শতকরা ৯ ভাগ সুদে ঋণ দেয়া হচ্ছে। এসএমই ফাউন্ডেশন ব্যাংক গুলোকে ৪% হারে ঋন দিচ্ছে তাদের নিজস্ব তহবিল হতে যাতে করে ব্যাংক গুলো ৯% হারে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋন দিতে পারে। এটি খুবই সফল একটি কর্মসূচি হিসেবে পরিগনিত হয়েছে কারন জামানত ছাড়াই এ ঋনের পরিশোধের হার শতকরা ৯৫ ভাগের উপর। মূলতঃ এসএমই ফাউন্ডেশনের সুবিধাভোগি প্রতিষ্ঠানগুলিই এ কর্মসূচির আওতায় ঋণ পাচ্ছে। এতে করে ঋন খেলাপির হার অতি নগন্য।

তহবিল সংকটের কারণে এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে এ কর্মসূচির পরিসর বাড়ানো কঠিন হয়ে পড়ছে। সরকার বর্ধিত তহবিল বরাদ্দ না করলে বা দাতাদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহে এসএমই ফাউন্ডেশনকে অনুমতি না দেয়া হলে এ কর্মসূচির পরিসর বাড়ানো কোনো মতেই সম্ভব নয়। সুষ্ঠু ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচি গ্রহণ ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে নিবিড় সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

সারণি ৮: এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায়

বছর	ঋন বিতরন (মিলিয়ন টাকা)	নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋন বিতরন (মিলিয়ন টাকা)	ঋন গ্রহনকারী পুরুষ উদ্যোক্তাদের সংখ্যা	ঋন গ্রহন কারী নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা	ঋন গ্রহণকারী মোট উদ্যোক্তাদের সংখ্যা
২০০৯	১২.৫	০	৩২(১০০%)	০	৩২
২০১০	৩৭.৫	০	৯০(১০০%)	০	৯০
২০১১	৬৭.৫	১৮.৫ (২৭.৪১%)	১২৫(৭৭.৬%)	৩৬ (২২.৪%)	১৬১
২০১২	১০৫	৩০.৮ (২৯.৩৩)	১৬২(৭৪.৩%)	৫৬ (২৫.৭%)	২১৮
২০১৩	১৯৮	৭০.৫ (৩৫.৬১%)	২৫৫ (৪৯.১%)	২৬৪ (৫০.৯%)	৫১৯
২০১৪	৩০৮	৮১.৫ (২৬.৪৬%)	৪১৫ (৫৬.৬%)	৩১৮ (৪৩.৪%)	৭৩৩
২০১৫	৪০৩	১১৩ (২৮.০৪%)	৫৩৭ (৫৯.৩%)	৩৬৯ (৪০.৭%)	৯০৬
২০১৬	৫৪০	১৩১ (২৪.২৬%)	৬৯২ (৬২.১%)	৪২৩ (৩৭.৯%)	১১১৫
২০১৭	৬০০	১৪২ (২৩.৬৭%)	৭৬৪ (৬৩.৫%)	৪৩৯ (৩৬.৫%)	১২০৩
CAGR(%)	৫৩.৭৫%	৮৩.৮%	৪২.৩%	৪২.৯৪%	৪৯.৬৩%

টীকা: ক্লাস্টার ও অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন।
উৎস: এসএমই ফাউন্ডেশন

৩.২। এসএমই খাতের অর্থায়নের প্রতিবন্ধকতা: জরিপের ফলাফল

এসএমই ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও দেশের ৬০ শতাংশের বেশি এসএমই এখনো আনুষ্ঠানিক ঋণ সুবিধার বাইরে রয়ে গেছে। এমনকি যেসব প্রতিষ্ঠান ঋণ সুবিধা পাচ্ছে সেখানেও কিছুটা ক্রেডিট গ্যাপ রয়েছে। এভাবে ব্যাপক ক্রেডিট গ্যাপের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক ঋণের চাহিদাও বিদ্যমান রয়েছে। আইএফসি ও ম্যাকিনসে (২০১১) এর যৌথ সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, এসএমই এর ক্ষেত্রে ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের (বাংলাদেশী টাকায় ১৪০ বিলিয়ন টাকা) ক্রেডিট গ্যাপ রয়েছে। এছাড়া উক্ত সমীক্ষায় ক্রেডিট গ্যাপের গড় মূল্যমান হিসাব করা হয়েছে প্রতিষ্ঠান প্রতি ১৭,০০০ মার্কিন ডলার (১৩,২৬,০০০ টাকার সমতুল্য)। ঋণ সুবিধা ভোগকারী ও ঋণ সুবিধা বঞ্চিত এসএমই ও ক্রেডিট গ্যাপকে বিবেচনায় নিয়ে এসএমই খাতের জন্য একটি ক্রেডিট টার্গেট পলিসি প্রণয়ন করা হবে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অর্থায়ন সমস্যা। অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সাধারণ বাধাসমূহ ছাড়াও নারী উদ্যোক্তাদের সেবা দেয়ার জন্য ব্যাংক শাখায় আলাদা ডেস্ক বা নির্দিষ্ট ব্যাংক সুবিধা না থাকা, অপর্যাপ্ত পুন:অর্থায়ন স্কীম, আর্থিক শিক্ষার অভাব ইত্যাদি নারী মালিকানাধীন এসএমইসমূহের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়/প্রতিবন্ধকতা।

সারণি-৯ এ এসএমইদের ঋন প্রাপ্তির তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। শতকরা ৪৪ ভাগ প্রতিষ্ঠান ঋণ পেয়েছে ব্যাংক থেকে যা বিসিকের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ। অন্যান্য ঋনের উৎসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: নিজস্ব (১৯.৪% এবং ৪৮.২৮%), এনজিও ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (৩০.৬% এবং ০.২৬%)।

সারণি ৯: এসএমইদের ঋন প্রাপ্তির তথ্য

	ঋনের উৎস		ঋনের পরিমান (গড়) (লক্ষ টাকা)		সুদের হার
	অন্যান্য এসএমই	বিসিক	অন্যান্য এসএমই	বিসিক	
ব্যাংক ঋণ	৪৪.৪%	৫১.১৩%	৩৬.২৫	১৫৮.২	১০.৯১
নিজ (friends, relatives)	১৯.৪%	৪৮.২৮%	২০.৩১	১৪৯.২	৬.৮৫
এনজিও ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ	৩০.৬%	০.২৬%	৪৯	--	১৫.৩০
অন্যান্য	৫.৬%	০	২৩.৭৫	--	১২.১৩
মোট এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা	৫০০	৫০০			

উৎস: বিআইডিএস জরিপ ২০১৭।

বিসিক শিল্পনগরীর প্রায় ৯১ শতাংশ ফার্মের নিজস্ব ব্যাংক হিসাব রয়েছে। তবে অন্যান্য এসএমই এর ক্ষেত্রে এ হার ৭০ ভাগের মত। বিসিক শিল্পনগরী থেকে ব্যাংকসমূহের গড় দূরত্ব ২.২ কিলোমিটার, সর্বনিম্ন শূন্য থেকে সর্বোচ্চ ৩৫ কিলোমিটার পর্যন্ত। বিসিক শিল্পনগরীগুলোর ২ কিলোমিটারের মধ্যে ব্যাংকের শাখা থাকলে ও অন্যান্য এসএমই এর থেকে গড়ে ১২ কিমি দূরে ব্যাংক অবস্থিত (সারণি-১০)।

সারণি ১০: আর্থিক সেবা-সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ

আকার	ব্যাংক হিসাবধারী ফার্মের শতকরা হার		ব্যাংকের গড় দূরত্ব (কি.মি.) (সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ)	
	শিল্পনগরী	অন্যান্য এসএমই	শিল্পনগরী	অন্যান্য এসএমই
অতিক্ষুদ্র/কুটির	২৪.৬৭			
ক্ষুদ্র	৬৩.৮৮			
মাঝারি	১১.৪৫			
সার্বিক	৯০.৮০	৭০.৫১	২.২ (০-৩৫)	১২.৩০
নমুনার সংখ্যা	৪৫৪	৫০০	৪৫৪	৫০০

উৎস: বিআইডিএস জরিপ ২০১৭।

জামানতের প্রধান উৎস হলো জমি ও দালান। জরিপকৃত ফার্মসমূহের প্রায় অর্ধেক জমি/দালান, ৩০ শতাংশ মেশিনারী ও ১৮.৩ শতাংশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি জামানত হিসেবে ব্যবহার করেছে (সারণি-১১)।

সারণি ১১: জামানতের ধরন (%)

জামানতের ধরন	অতিক্ষুদ্র/কুটির	ক্ষুদ্র	মাঝারি	গড়
জমি/দালান	৪২.৭৪	৪৮.৮৬	৪২.৩৭	৪৬.৭৭
মেশিনারী	২৩.৯৩	৩১.৭১	২৫.৪২	২৯.২৮
ব্যক্তিগত সম্পত্তি (বাড়ি/জমি)	২৭.৩৫	১৫.১৪	১৮.৬৪	১৮.২৫
অন্যান্য	৫.৯৮	৪.২৯	১৩.৫৬	৫.৭০
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস: বিআইডিএস জরিপ ২০১৭।

জরিপকৃত সকল ফার্মের মধ্যে ৫৭.৫ শতাংশ তাদের ঋণের টাকা চলতি মূলধনে ব্যবহার করে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ফার্মসমূহের এক-চতুর্থাংশ এবং মাঝারি ফার্মসমূহের এক-পঞ্চমাংশ ঋণের টাকা দিয়ে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। সকল ফার্মের প্রায় ১০ শতাংশ ঋণের টাকা জমি ও দালান উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করে (সারণি-১২)।

সারণি ১২: ঋণের ব্যবহার (%)

উৎস	অতিক্ষুদ্র/ কুটির	ক্ষুদ্র	মাঝারি	গড়
চলতি মূলধন	৫৫.৭৪	৫৮.১২	৫৭.১৪	৫৭.৪৭
জমির উন্নয়ন/দালান নির্মাণ/সংস্কার	৯.০২	১১.৪০	১০.৭১	১০.৭৮
কর্মীদের প্রশিক্ষণ		০.২৮		০.১৯
পণ্যের প্রসার		০.৫৭		০.৩৮
খানার ব্যয়	৩.২৮	২.৫৬		২.৪৬
মেশিনারী ক্রয়	২৫.৪১	২৪.২২	১৯.৬৪	২৪.০১
অন্যান্য	৬.৫৬	২.৮৫	১২.৫০	৪.৭৩
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস: বিআইডিএস জরিপ ২০১৭।

এসএমই ঋণের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া এখনো একটি জটিল বিষয়। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে মানসম্মত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা সত্ত্বেও ঋণের আবেদন প্রক্রিয়া অত্যন্ত দীর্ঘ ও জটিল রয়ে গেছে। পর্যাপ্ত জ্ঞান/ধারণা ও কর্তৃত্বের অভাবের কারণে ব্যাংক কর্মকর্তারা ঋণের আবেদন অনুমোদনে দীর্ঘ সময় নিয়ে থাকে। ঋণ অনুমোদনে বেশির ভাগ ব্যাংক কেন্দ্রীকৃত এপ্রোচ অনুসরণ করায় ঋণ অনুমোদনে প্রতিটি ব্যাংকের ৪০-৬০ দিন লাগে। এতে প্রকৃত উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসা পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

অর্থায়নের বিকল্প উৎস থাকায় প্রায় ৪০ শতাংশ ফার্ম ব্যাংক ঋণের জন্য আবেদন করেনি। ঋণের জন্য ব্যাংকের দ্বারস্থ না হওয়ার কারণ হতে পারে ঋণের আবেদন প্রত্যাখাত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা (২৮.৯৩ শতাংশ) এবং উচ্চ সুদ হার (১২.০৮ শতাংশ) (সারণি- ১৩)।

সারণি ১৩: আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণের জন্য আবেদন না করার কারণ (%)

কারণ	অতিক্ষুদ্র/কুটির	ক্ষুদ্র	মাঝারি	গড়
প্রত্যাখাত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা	১৯.৬৩	৩৪.৯৩	২২.৫০	২৮.৯৩
বিকল্প উৎস থাকা	৪৪.৮৬	৩৫.৮৯	৪৫.০০	৩৯.৬১
জটিল প্রক্রিয়া	৪.৬৭	৫.২৬	৫.০০	৫.০৬
উচ্চ সুদ হার	১১.২১	১২.৪৪	১২.৫০	১২.০৮
জামানত প্রদানের কঠোর শর্ত	৪.৬৭	৪.৩১		৩.৯৩
অন্যান্য	১৪.৯৫	৭.১৮	১৫.০০	১০.৩৯
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস: বিআইডিএস জরিপ ২০১৭।

৩.৩। এসএমই খাতের অর্থায়নের জটিলতা নিরসনে কিছু প্রস্তাবনা

(ক) এসএমই ব্যাংক স্থাপন ও ব্যাংকের শাখা থানা পর্যায়ে বাড়ানো: বানিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিভিন্ন নিয়ম কানুন যেমন জামানত সংরক্ষন, গ্যারান্টর যোগাড় করা ইত্যাদি কারনে বেশিরভাগ এসএমই ব্যাংক থেকে ঋন নিতে পারেনা। তাছাড়া, স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাংকের শাখা না থাকায় এসএমইদের কার্যক্রমও ব্যাংক গুলোর নিকট পরিস্ফুট না হওয়ায় তাদেরকে খেলাপি হওয়ার ভয়ে ব্যাংকগুলো ঋন অনুমোদন করে না। ব্যাংক ঋন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক-কাস্টমার সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। তাই স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাংক শাখার সম্প্রসারন হতে পারে এসএমই ঋন প্রাপ্তির একটি উপায়। সম্প্রতি একটি গবেষনায় এমনটিই পুর্বাভাস দেয়া হয়েছে (Hossain, Yoshino and Taghizadeh-Hesary 2020)। এ গবেষনাটিতে বাংলাদেশের থানা পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষন করে দেখানো হয়েছে যে, স্থানীয় পর্যায়ের আর্থিক খাতের উন্নয়ন (ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি) তথা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ফলে এসএমই খাতের তাতপর্যপূর্ণ উন্নতি হয়। তাই বাংলাদেশ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর জন্য যেসকল পদক্ষেপ নিচ্ছে অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায়ে বানিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা ও প্রনোদনা দেয়া, এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারন করা, ইত্যাদি পদক্ষেপ আরো বেগবান করতে হবে যাতে করে এসএমই ভিত্তিক উন্নয়ন বেগবান করা যায়।

তবে একটি বিশেষায়িত এসএমই ব্যাংক এ ধরনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে। তাই এসএমই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নীতিনির্ধারকদের সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

(খ) এসএমই ফাউন্ডেশন এর ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচি আওতা ও পরিধি বাড়ানো

এসএমই ফাউন্ডেশন তাদের নিজস্ব অর্থায়নে গত বেশ কয়েক বছর যাবত বিনা জামানতে এবং ৯% সুদে ব্যাংকের মাধ্যমে "ক্রেডিট হোলসেলিং" নামে একটি ঋন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ঋন কার্যক্রমটি বেশ সফল হয়েছে কারন জামানত ছাড়াই ঋন আদায়ের হার শতকরা ৯৫ ভাগের ওপরে। যদিও তহবিলের স্বল্পতার কারনে ঋণ কার্যক্রমটি শুধুমাত্র কিছু ক্লাস্টারে সীমাবদ্ধ রয়েছে, এর তহবিল বাড়িয়ে এ ঋণ কার্যক্রমটি আরো সম্প্রসারন করা যেতে পারে। এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ব্যাংক এর নিবিড় তদারকির ফলে ঋন কার্যক্রমটি যেমন সফল হয়েছে, তেমনি এসএমইদের উন্নয়নে এটি ভূমিকা রেখে চলেছে (এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে)।

৪। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই এর ভূমিকা: বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

বিশ্বের বেশির ভাগ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে এসএমই কৌশলগত গুরুত্ব দখল করে রেখেছে (Bala 2008)। শিল্পায়নে এসএমই খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে জাপানের সফলতা বিপুল প্রশংসিত। জাপানের এসএমই খাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো জাপানের এসএমইগুলো সাবকনট্রাকটিং পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বৃহৎ ফার্মের সাথে সংযুক্ত থাকে। সাবকনট্রাকটিং হলো বৃহৎ ফার্ম থেকে এসএমইতে কারিগরি সহায়তা, আর্থিক সহায়তা, উপকরণ সরবরাহ, ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা

ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ফার্মসমূহের মধ্যে উলম্ব সহযোগিতা স্থাপনের মাধ্যমে এসএমইগুলোর কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্য বা সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর সাবকনট্রাকটিং এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে ।

আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো প্রায়শ এসএমই খাতের উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে সফলতার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখিত হয়ে থাকে। এসএমই যেহেতু উৎপাদন নেটওয়ার্কের পশ্চাৎসংযোগ হিসেবে কাজ করে সেহেতু তারা আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক একীভূতকরণের ভিত্তি প্রদান করে। আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৮৯-৯৯ শতাংশই এসএমইভুক্ত। এছাড়া এসএমই খাত মোট কর্মসংস্থানের ৫২-৯৭ শতাংশ, জিডিপির ২৩-৫৮ শতাংশ এবং মোট রপ্তানির ১০-৩০ শতাংশের যোগান দিচ্ছে। আসিয়ান দেশগুলোতে এসএমইগুলো পার্টস ও এক্সেসরিজ সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদন নেটওয়ার্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারণি ১৪: নির্বাচিত বছরে অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান

দেশ	মোট প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার		মোট কর্মসংস্থানের শতকরা হার		মোট জিডিপির শতকরা হার		মোট রপ্তানির শতকরা হার অংশ	
	হার	বছর	হার	বছর	হার	বছর	হার	বছর
ব্রুনেই দারুসসালাম	৯৮.২%	২০১০	৫৮.০%	২০০৮	২৩.০%	২০০৮	-	-
কম্বোডিয়া	৯৯.৮%	২০১১	৭২.৯%	২০১১	-	-	-	-
ইন্দোনেশিয়া	৯৯.৯%	২০১১	৯৭.২%	২০১১	৫৮.০%	২০১১	১৬.৪%	২০১১
লাও পিডিআর	৯৯.৯%*	২০০৬	৮১.৪%	২০০৬	-	-	-	-
মালয়েশিয়া	৯৭.৩%	২০১১	৫৭.৪%	২০১২	৩২.৭%	২০১২	১৯.০%	২০১০
ডময়ানমার	৮৮.৮%**	-	-	-	-	-	-	-
ফিলিপাইন	৯৯.৬%	২০১১	৬১.০%	২০১১	৩৬.০%	২০০৬	১০.০%	২০১০
সিঙ্গাপুর	৯৯.৪%	২০১২	৬৮.০%	২০১২	৪৫%	২০১২	-	-
থাইল্যান্ড	৯৯.৮%	২০১২	৭৬.৭%	২০১১	৩৭.০%	২০১১	২৯.৯%	২০১১
ভিয়েতনাম	৯৭.৫%	২০১১	৫১.৭%	২০১১	-	-	-	-

*টীকা: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (২০১৩) * , ** নিবন্ধীকৃত সংখ্যা*
উৎস: কান্ট্রি প্রতিবেদনসমূহ।

৪.১ । এসএমই খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: আসিয়ান অভিজ্ঞতা

এসএমই খাতের উন্নয়নে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সফল হওয়ার অন্যতম কারণ হলো তারা এসএমই খাতের জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। সিঙ্গাপুরের ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

মন্ত্রণালয়াধীন স্ট্যান্ডার্ডস, প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন বোর্ড অব সিঙ্গাপুর (SPRING) হলো সে দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। অর্থায়ন, সামর্থ্য ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন এবং বাজার প্রবেশের সুযোগ লাভ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তাকরণে এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের মুখ্য সংস্থা হিসেবে SPRING অংশীদারদের সাথে একযোগে কাজ করে। অধিকন্তু SPRING আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্ট্যান্ডার্ডস ও মান নিশ্চয়তা অবকাঠামো সৃষ্টি ও প্রসারের জন্য কাজ করে।

মালয়েশিয়ায় এসএমই খাতে নীতি নির্দেশনা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল এসএমই ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এনএসডিসি) এবং নীতি প্রণয়ন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এজেন্সির এসএমই সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির বাস্তবায়ন সমন্বয়ের জন্য আলাদা কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সংস্থা এসএমই কর্পোরেশন মালয়েশিয়া (SME Corp.) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১১ সালে মানব পুঁজির উন্নয়ন, অর্থায়ন প্রাপ্তির সুযোগ প্রদান, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি গ্রহণ, বাজার প্রবেশ সুবিধা প্রদান ইত্যাদির বিপরীতে ১৮৩টি কর্মসূচিতে ৪.৭ বিলিয়ন রিঙ্গিত ব্যয় করা হয়। এছাড়া মালয়েশিয়া সরকার এসএমই মাস্টার প্ল্যান ২০১২-২০২০ অনুমোদন দিয়েছে। নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাজ সমন্বয়ের দায়িত্ব সেদেশের সমবায় ও এসএমই মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত রয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় এসএমই উন্নয়ন কৌশলসমূহ ন্যাশনাল মিডিয়াম ডেভেলপমেন্ট প্লান (RPJM ২০১০-২০১৪) এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা স্ব স্ব বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও এজেন্সির কৌশলগত পরিকল্পনা কর্তৃক অনুসৃত হয়। এ প্ল্যানে ৭টি কৌশলগত লক্ষ্যের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়: (১) জাতীয় অর্থনীতিতে সমবায় এবং অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের (এমএসএমই) অবদান বৃদ্ধিসহ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, (২) সমবায় ও এমএসএমই'র শক্তি বৃদ্ধি করা, (৩) সমবায় ও এমএসএমই কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানো, (৪) সমবায় ও এমএসএমইকে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা ও ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা, (৫) সমবায় ও এমএসএমই এর উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করা, (৬) সমবায় ও এমএমএমই বান্ধব ব্যবসা পরিবেশের উন্নতি সাধন, এবং (৭) সমবায় ও এমএসএমইতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা। প্রতি ছয় মাস (সেমিস্টারে) অন্তর মন্ত্রণালয় এসএমই উন্নয়ন কৌশলের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে।

আসিয়ানভুক্ত আরেকটি দেশ থাইল্যান্ড শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীনে অফিস অব এসএমই প্রমোশন প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি এসএমই-বিষয়ক রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের বিন্যাস ও সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা। আবর্তক পঞ্চবর্ষী এসএমই প্রমোশন মাস্টার প্ল্যান এর আওতায় এসএমই খাতের উন্নয়ন কৌশলসমূহ বাস্তবায়িত হয়। বিশ্ব বাজারে এসএমই পণ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য তৃতীয় এসএমই প্রমোশন মাস্টার প্ল্যান নেয়া হয়েছে। থাইল্যান্ডের এসএমই খাতকে শক্তিশালী ও বেগবান করতে ৪টি কৌশল নেয়া হয়েছে: (১) উন্নয়নের সকল স্তরে এসএমই খাতের বিকাশ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা (এসএমই ব্যবসা রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, ২০১৬ সাল নাগাদ ২৫০,০০০টি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা), (২) ব্যবসায় দক্ষতা উন্নয়ন, এসএমই ক্লাস্টার গঠন এবং পণ্যের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ডস এর মানোন্নয়নের (২০১৬ সাল নাগাদ নির্বাচিত খাতসমূহে কমপক্ষে ৩০,০০০ এসএমই স্থাপন) মাধ্যমে থাইল্যান্ডের এসএমই শিল্পখাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, (৩) এলাকাভিত্তিক সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে এসএমই খাতের সুষম উন্নয়ন, এবং (৫) ব্যাপকতর বাজার সম্পৃক্তকরণ ও আন্তর্জাতিকীকরণে

(বছরে ন্যূনতম ৬০টি নতুন ব্যবসা নেটওয়ার্ক) যুক্ত হতে থাইল্যান্ডের এসএমইসমূহের সামর্থ্য ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

বাংলাদেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে পূর্ব এশিয়ার সফলতার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে। জাতীয় এসএমই নীতি ২০১৯ এ বাংলাদেশের এসএমই খাতের জন্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক উত্তম প্র্যাকটিসের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৫। উপসংহার ও নীতি প্রস্তাবনা

বিশ্বের অনেক দেশে উচ্চমাত্রার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (এসএমই) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এটি একটি শ্রমনিবিড় শিল্প খাত এবং পণ্য উপাদন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই এখাতে উঁচু স্তরের প্রযুক্তির প্রয়োজন হয় না। বেশির ভাগ এসএমই শ্রমনির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। স্বল্প পুঁজিনির্ভর ও উৎপাদন-সময়কাল স্বল্প হওয়ায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এসএমই অবদান রাখতে সক্ষম। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এসএমই খাতের বিকাশ ও উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে এসএমই অনুঘটকের (ক্যাটালাইটিক) ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশে এসএমই সংক্রান্ত জাতীয় পর্যায়ের পরিসংখ্যানের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। তা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র পরিসরের কিছু সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে ইতোমধ্যে এসএমই খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে দেশে কুঠির শিল্পসহ প্রায় ১ কোটি অতি ক্ষুদ্র (মাইক্রো), ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এমএসএমই) শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা দেশের মোট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৯৮ শতাংশ এবং জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান ২৫ শতাংশ বা তারও বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত সর্বশেষ অর্থনৈতিক শুমারিতে এসএমইসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ অনুসারে দেশের মোট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ১০.৯ শতাংশ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ইউনিট, যা দেশের মোট কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থানের ৩০ শতাংশের যোগান দিয়ে থাকে এবং অবশিষ্ট কর্মসংস্থান আসে ব্যবসা ও সেবা খাত থেকে।

এসএমই খাতে এ পর্যন্ত সাধিত অগ্রগতিকে ধরে রেখে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কেননা এসএমই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিপুল অবদান রাখছে। দেশের বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা দলিল, যেমন কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২১, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, শিল্পনীতি ২০১৬ এ উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জনে এসএমই খাতের উন্নয়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশে এসএমই খাত বিকাশের অমিত সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে পর্যাপ্ত মানব সম্পদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্যের কারণে। তবে এ খাতকে গতিশীল করার জন্য অনুকূল ও সাযুজ্যপূর্ণ নীতি পরিবেশের যথেষ্ট ঘাটতিও রয়েছে। এসএমই খাতের উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৫ সালে এসএমই নীতি প্রণীত হয়। তবে এ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য কোনো কর্মপরিকল্পনা ছিল না। এ প্রেক্ষিতে সরকার যথোপযুক্ত কর্মপরিকল্পনাসহ একটি ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় এসএমই নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে যা

২০১৯ সালে প্রণীত হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর এসএমই নীতি প্রনয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন কারন এসএমই সেক্টর একটি অতি সংবেদনশীল ও পরিবর্তনশীল সেক্টর।

এসএমই খাতের বিকাশকে বেগবান করার লক্ষ্যে এ খাতের সংস্কারকে এগিয়ে নিতে সঠিক কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সুষ্ঠ এসএমই কৌশল গ্রহণ প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) অনুকূল নীতি ও রেগুলেটরী পরিবেশ, (২) টেকসই ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান, এবং (৩) অসচ্ছল ও সুবিধাবঞ্চিত উদ্যোক্তাদের (মহিলা, গ্রামীণ দরিদ্র, যুবক, অক্ষম ব্যক্তি ও সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ) আর্থিক ও ব্যবসা সহায়ক সেবা সহায়তা লাভের সুযোগ প্রাপ্তি। এ তিনটি প্রধান বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এসএমই উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় এসএমই নীতি ২০১৯-এ নীতিগত ও রেগুলেটরী সংস্কার কার্যক্রম প্রসারে কৌশল গ্রহণের পাশাপাশি এসএমইকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ও দীর্ঘমেয়াদে ব্যবসা উন্নয়ন ও আর্থিক সেবা সহায়তা প্রদানকারী আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও সেগুলোকে শক্তিশালীকরণে সহায়তাকল্পে কৌশল গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

এসএমই সংশ্লিষ্ট চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া ও নীতিসমূহ বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় এসএমই নীতি ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় এসএমই নীতিতে রেগুলেটরী সংস্কার ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ও পদ্ধতি সহজীকরণ ও সরলীকরণের মাধ্যমে এসএমই খাতের সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীতব্য একগুচ্ছ কর্মকৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মানব সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবসা উন্নয়ন সেবা, অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ এবং প্রযুক্তির বিকাশ বৃদ্ধির কৌশল জাতীয় এসএমই নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ন বিষয় হচ্ছে এসব নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং এ লক্ষ্যে সঠিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়া।

References:

Asian Development Bank (ADB) (2015). Asian Development Bank (ADB) (2015). Asia SME Finance Monitor, Asian Development Bank, Manila.

Ahmed, M.U. (2016). A Theoretical Framework for Analysing the Growth and Sustainability of Small and Medium Enterprises (SMEs), International Journal of SME Development, Issue 2, 2016.

ERIA (2012). ASEAN SME Policy Index 2014, ERIA Research Project Report No. 8, 2012, Economic Research Institutes for ASEAN and East Asia.

Bakht, Zaid and Basher, Abul (2014), "Strategy for Development of the SME Sector in Bangladesh", Background paper for the Seventh Five Year Plan, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS)

Bakht, Z. and Hossain, M. (2012). A Review of Equity Entrepreneurship Fund, Unpublished Researh Report, BIDS.

BBS (2001; 2013). Economic Census 2001 and 2003, National Report. Bangladesh Beaurue of Statistics.

BBS (2010) Report on Bangladesh Survey of Manufacturing Industries (SMI) 2005-2006

Hossain, M., Yoshino, N. and Taghizadeh-Hesary, F. (2020). Optimal branching strategy, local financial development and SMEs performances, *Economic Modelling*, Forthcoming.

IFC (2013). Closing the Credit Gap for Formal and Informal Micro, Small, and Medium Enterprises, IFC, The World Bank

INSPIRED (2013). The state of the SME sector – the manufacturing SME sector in Bangladesh, Working Paper # 3

Islam, N., Zohir, S., and Hossain, Monzur (2009). "SMEs Development in Bangladesh with Emphasis on Policy Constraints and Financing" in M. K. Mujeri and ShamsulAlam (eds.) *Economic Sectors: Background Papers for the Sixth Five Year Plan, Vol. 2, 2011*

Ministry of Industry (2005). National SME Policy Strategy, 2005

Ministry of Industry (2019). Industrial Policy 2019, Bangladesh.

SME Foundation (2006/07). Report on the Survey of Six Sectors: Baseline, Profile Performance and Plan for Upgrading

SME Foundation (2013). SME Clusters in Bangladesh.

Subrahmanya, Bala MH (2008). Manufacturing SMEs in Japan: more subcontracting intensive versus less subcontracting intensive industries, *Int. J. Management and Enterprise Development, Vol. 5, No. 5, 2008*

Appendix

সারণি ১৫: জিডিপি ও অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির হার (%)

বছর	মোট	সেক্টরাল জিডিপি প্রবৃদ্ধি		
	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	কৃষি	শিল্প	সেবা
১৯৭২/৭৩-১৯৭৯/৮০	৩.৬৮	১.৮৬	৫.২৬	৫.১৭
১৯৮০/৮১-১৯৮৯/৯০	৩.৯০	১.৮৪	৩.১৬	৫.৪৩
১৯৯০/৯১-১৯৯৯-২০০০	৪.৯০	৩.০৩	৭.৩৭	৪.৫৬
২০০০/০১-২০০৯/১০	৬.০৩	৩.৬৬	৭.৭৪	৭.০০
২০১০/১১-২০১৪/১৫	৬.৩১	৪.৪৬	৮.৩০	৬.৩৭
২০১৫/১৬-২০১৯/২০	৭.৬	৩.৬৯	১১.৭০	৬.৬২

উৎস: বিবিএস; বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রনালয়, ২০২০।

সারণি ১৬। জিডিপিতে খাতভিত্তিক অবদান (%)

বছর	কৃষি	শিল্প	ব্যবসা
১৯৭২-৭৩	৪৯.৭৬	৯.০০	৩৬.৪৬
১৯৮০-৮১	৪৬.৫৮	১১.০৮	৪২.৩৪
১৯৯০-৯১	২৯.২৩	২১.০৪	৪৯.৭২
২০০০-০১	২৫.০৩	২৬.২০	৪৮.৭৭
২০১০-১১	১৮.০০	২৭.৩৮	৫৪.৬১
২০১১-১২	১৭.৩৮	২৮.০৮	৫৪.৫৪
২০১২-১৩	১৬.৭৮	২৯.০০	৫৪.২২
২০১৩-১৪	১৬.৫০	২৯.৫৫	৫৩.৯৬
২০১৪-১৫	১৫.৯৬	৩০.৪২	৫৩.৬২
২০১৫/১৬	১৫.৩৫	৩১.৫৪	৫৩.১২
২০১৬/১৭	১৪.৭৪	৩২.৪২	৫২.৮৫
২০১৭/১৮	১৪.২৩	৩৩.৬৬	৫২.১১
২০১৮/১৯	১৩.৬৫	৩৫.০০	৫১.৩৫

উৎস: বিবিএস; Bangladesh Econoimic Review, 2020, Ministry of Finance.

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দর্শন

ড. শাহ্ মোঃ আহসান হাবীব *

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক পথ পরিক্রমায় সম্প্রতি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং উন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিগত দশকে স্থিতিশীল ও উচ্চ উন্নয়ন হার অর্জনকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নের যে যাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশ তার বেশ কিছু ধাপ দেশটি ইতোমধ্যে পেরিয়ে গেছে। অতি সম্প্রতি, বাংলাদেশ জনপ্রতি আয়ের বিবেচনায় ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। এখন সময় এসেছে অধিক গুরুত্বের সঙ্গে সমতাভিত্তিক অর্থনীতির পথে বাংলাদেশকে পরিচালনা করা, যার বীজ রোপিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন প্রথম সরকারের সময়ে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের মধ্যেই শোষণমুক্ত-সমতাবাদী সমাজ ও অর্থনীতির বীজ সুপ্ত ছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত ১৯৭১ সালের পরবর্তী বাংলাদেশ ছিল একটি বিধ্বস্ত অর্থনীতি। বেশির ভাগ সড়ক, সেতু ও অবকাঠামো বিনষ্ট করা হয়েছিল। শিল্পকারখানা ছিল বিধ্বস্ত অথবা উৎপাদনের অযোগ্য। কৃষি খাতে উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী দুই বছর কাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ আর্থিক এবং অবকাঠামো ধ্বংসের বিবেচনায় নিরূপণ করা সম্ভব নয়। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলাদেশের অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা, সাধারণ মানুষ জীবন হারিয়েছেন, পরিবার ও সামাজিক কাঠামো বিনষ্ট হয়েছে এবং দেশকে মেধা ও নেতৃত্বশূন্য করা হয়েছে।

বহির্বিশ্বের প্রতিকূল ব্যবসায় ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও বাংলাদেশের অনুকূলে ছিল না। জ্বালানি তেলের মূল্য হঠাৎ করে অস্বাভাবিক বেড়ে যায় স্বাধীনতার পরের দুই বছরে। বিশ্ববাজারে গম ও সারের মূল্য তিন গুণে উন্নীত হয় এবং প্রায় সারা বিশ্বে নজিরবিহীন মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু সরকার ও তৎকালীন পরিকল্পনা কমিশন খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের

* ড. শাহ্ মোঃ আহসান হাবীব বর্তমানে অধ্যাপক (সিলেকশন গ্রেড) হিসেবে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এ কর্মরত রয়েছেন। ভারত সরকারের শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা বৃত্তির আওতায় পিএইচডি সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে সিনিয়র ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাইরাকিউস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রীন ব্যাংকিং এ পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশীপ অর্জন করেন। ২৫ বছরের কর্মজীবনে দুই শতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ/গবেষণাপত্র দেশে/বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। কলাম লেখক হিসেবে অর্থনীতি ও আর্থিক খাত বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজী দৈনিকে দুই শতাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

পাশাপাশি অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণে নিয়োজিত হন। তৎকালীন সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় স্বনির্ভরতা মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পায়। সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সরকারি ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিলেও বেসরকারি খাতকে নিরুৎসাহিত করা হয়নি।

অনেক অপ্রাপ্তির মধ্যেও বাংলাদেশ বর্তমানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকগুলোতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে চলেছে। আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার মতো উন্নতি স্পষ্ট। মাথাপিছু জাতীয় আয়, শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু, নারী ক্ষমতায়ন, জীবনের প্রত্যাশিত আয়ুর মতো অনেক সূচকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের চেয়ে অনেক ভালো অর্জনের অধিকারী হতে পেরেছে। আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি অসংখ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে চলেছে। দেশব্যাপী উন্নতমানের ঘরবাড়ি স্থাপন ছাড়াও পুকুরে মাছের চাষ, মুরগি ও গরুর খামারসহ নানা ধরনের আয় উৎসারণমুখী ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, আধুনিক কৃষি খামার, ফুলের চাষ, কুটিরশিল্পের মতো নানা উদ্যোগের সূচনা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি দেশের সার্বিক উন্নয়নে সব ক্ষেত্রে সহযোগী হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনুকরণীয় হিসেবে গণ্য হচ্ছে বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানব উন্নয়ন, গড় আয়ু বৃদ্ধি, খাদ্যে উন্নয়ন, মাতৃমৃত্যুর হার কমানো, নারীর ক্ষমতায়নে এদেশের অগ্রগতির প্রশংসা করছে খোদ জাতিসংঘ।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের বিষয়গুলো সংবিধানের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। তাঁর অর্থনৈতিক দর্শন ছিল রাষ্ট্রের উন্নয়নে সমতার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা সম্পন্ন রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা, যার প্রতিফলন সংবিধানে অত্যন্ত স্পষ্ট। বর্তমান সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টা ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়াস স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধানে যথাযথভাবে প্রতিস্থাপন করে গেছেন বঙ্গবন্ধু। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও তাগিদ পাওয়া যায় স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারের সময়। যথাযথ উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহুরে জনপদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা এবং তা বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন পাওয়া যায় বাংলাদেশ সংবিধানের বিভিন্ন ধারাতে, যা তৎকালীন সরকারের চিন্তাকে তুলে ধরে। গ্রামীণ ঋণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি, খাদ্য নিরাপত্তা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের বিষয়গুলো পরবর্তী সময়ে বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলো ওই সময়ই আলোচনায় আনা হয়েছিল, যা বর্তমান সময়ের সহস্রাব্দ উন্নয়ন সূচক ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আওতায় সারা বিশ্বে পরিপালন করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান আদর্শের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের অর্থনীতি কতটা এগিয়ে যেতে পেরেছে আর সেখানে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ এ গবেষণা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যে ও প্রতিপাদ্য। গবেষণাপত্রটি মূলত প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে প্রকাশনার প্রেক্ষাপট আলোচনার পর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে স্বাধীনতা-পরবর্তী অর্থনৈতিক ভিত্তির সূচনার কথা। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের ভিত্তির সামঞ্জস্যতা স্থান পেয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শনে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের

প্রতিফলন আলোচিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-দর্শনে ক্ষুদ্র ও কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন দর্শন আলোচনা করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে, বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ উন্নয়ন রূপরেখা সম্পর্কে মন্তব্য ও মতামত প্রদান করা হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তি রচনা

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে তৎকালীন সরকারের প্রধানতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে অর্থনীতিকে দাঁড় করানো এবং এর পুনর্গঠন। মহান স্বাধীনতা অর্জনের পাশাপাশি একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে গড়ে তোলার নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসার পরপরই এক কঠিন অর্থনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি হন তিনি। 'ব্যাংকে টাকা নেই, ট্রেজারি খালি, টাকাপয়সা সোনাদানা কিছুই নেই। সবকিছু লুট করে নিয়ে গেছে পাকিস্তানের লুটেরা বাহিনী।...আত্মসমর্পণের আগে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট; পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে ঘরবাড়ি, অফিস-আদালত দোকানপাট।...সমুদ্রবন্দর, নৌবন্দর, রেললাইন সবই ধ্বংস। বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ আহত হয়েছেন কিংবা পঙ্গুত্ববরণ করেছেন অগণিত মানুষ...ভারতে উদ্বাস্তু ১ কোটি মানুষ ফিরে এসেছেন শূন্য হাতে পোড়ামাটির ভিটায়। যুদ্ধের বছরে প্রায় কোনো ফসলই ফলেনি। স্বাধীনতার পরের বছরও পূর্ণাঙ্গ চাষাবাদ শুরু করা সম্ভব হয় নাই। জমিতে ভয়ংকর মাইন বসিয়ে রেখে গেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা। গবাদি পশুপাখি অধিকাংশই গেছে পাঞ্জাবি এবং তাদের দোসর আলবদর ও রাজাকারদের পেটে...দেশে বিপুল খাদ্যঘাটতি দেখা দিয়েছে। সমুদ্রবন্দরে যেসব জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে এগুলো অপসারণ না করলে বিদেশি জাহাজ তীরে ভিড়তে পারছে না। দেশের কলকারখানায় পাকিস্তান আমলে তৈরি পণ্য বিদেশে পাঠানো যাচ্ছে না। কাঁচামালও আনা সম্ভব হচ্ছে না। মানবসৃষ্ট এত বড়ো দুর্যোগ মানব ইতিহাসে খুব কমই দেখা গেছে' (কাশেম ২০১৯)। এ সময় বিশ্ব পরিস্থিতিও চরম প্রতিকূল ছিল। সাইদুজ্জামান (২০১৮) তাঁর লেখনীতে এ সময়ের প্রতিকূল বহির্বিশ্বের পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। তাঁর বর্ণনানুসারে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৭২-৭৩ সালে বহির্বিশ্বের পরিস্থিতিও ছিল চরম প্রতিকূল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই মার্কিন প্রশাসন 'স্মিথসোনিয়ান এগ্রিমেন্ট' বাস্তবায়ন করে অর্থাৎ স্বর্ণ থেকে ডলারকে পরিবর্তন করার যে সমীকরণ ছিল, তা রহিত করা হয় ফলে, পুরো বিশ্বে এবং উন্নত অর্থনীতিগুলোর অনেকগুলোয় আন্তর্জাতিকভাবে নজিরবিহীন মূল্যস্ফীতি দেখা দিল। তিন মার্কিন ডলার জ্বালানি তেলের মূল্য হঠাৎ করে বেড়ে ১১ ডলারে উন্নীত হয় ১৯৭২-৭৩ সালে। এ সময়ে বিশ্ববাজার পরিস্থিতি ছিল অস্থিতিশীল এবং আমদানি ব্যয়ও ছিল অত্যধিক। বিশ্ববাজারে শস্য ও সারের মূল্য তিন গুণে উন্নীত হয় এবং প্রায় সারা বিশ্বে নজিরবিহীন মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়। এ অবস্থায় দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নতুন মাত্রা যোগ করে। স্বাভাবিকভাবে ১৯৭০-১৯৭২ এই দুই বছরে দেশজ উৎপাদন ও জিডিপি বৃদ্ধির হার কমে যায় এবং স্বাধীন বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি দাঁড়ায় ৪০ লক্ষ টন (কাশেম ২০১৯)।

এমন এক অবস্থায় স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়ন ভিত্তি রচনার কাজ শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত ভয়াবহ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের বাস্তবায়ন শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক

অঙ্গীকার এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য প্রণীত সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে। 'কেমন বাংলাদেশ চাই' প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বেতার ও টিভি ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাস করে। এটা কোনো অগণতান্ত্রিক কথা নয়। আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনার জন্য পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ব।' (মনওয়ার ২০১৯)। সংবিধানের ১৫ নম্বর ধারা অনুসারে পরিকল্পিত উন্নয়নসংক্রান্ত রাষ্ট্রের মূল দায়িত্বের বাস্তবায়নের প্রকাশ ঘটে ১৯৭৩ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে প্রোথিত 'সমতা ও সামাজিক বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন' লক্ষ্য অর্জনের সুসংহত দলিল এবং বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপ। মুক্তিযুদ্ধের মূল চার নীতির ভিত্তিতে শিল্প খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ করা হয়। এ সময়ের উন্নয়নমুখী সিদ্ধান্তগুলোর যৌক্তিকতা নিরূপণে তৎকালীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থায় এবং তা উন্নয়নের লক্ষ্য ও কৌশল; এবং সার্বিকভাবে অর্থনীতির পুনর্গঠনে এবং মৌলিক প্রয়োজনের দিকগুলোকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনর্গঠনে সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করাই ছিল সরকারের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়নকেও যথাযথভাবে গুরুত্ব না দেওয়ার অবকাশ ছিল না। তৎকালীন সময়ের সম্পদের স্বল্পতা এবং আর্থিক সক্ষমতার কথা বিবেচনায় রেখে এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে কলকারখানা এবং বড়ো বড়ো অবকাঠামো সরকারিকরণ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, শিল্পকারখানার ব্যবস্থাপনা পর্ষদে ৪০ শতাংশ শ্রমিক থাকবেন। এ সমস্ত সমতাভিত্তিক অর্থনীতির পদক্ষেপসমূহ সংবিধান প্রণয়নের পর ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরের বাজেট-বক্তৃতায় বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়েছিল (সাইদুজ্জামান ২০১৮)। সময় ও বাস্তবতার বিবেচনায় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারি খাতে ব্যয় ধরা হয়েছিল বাজেটের ৮৮ ভাগ এবং প্রায় ১২ ভাগ বেসরকারি খাতে, যেখানে কৃষির ওপর নির্ভরতা স্পষ্ট এবং শিল্প উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (ছক-১)। সামাজিক ভোগের আওতায়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বড়ো পরিবর্তন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়; যেমন, হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ৮০ শতাংশ বাড়িয়ে ২২ হাজার ২০০-তে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়।

ছক-১ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যয় কাঠামো (কোটি টাকায়)

	মোট	সরকারি	বেসরকারি
কৃষি ও পানি	১০৬৭	১০৪১	২৬
শিল্প	৮৭৭	৭৩৮	১৩৯
বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৫২২	৫২২	-
পরিবহণ	৫৯৪	৫২৮	৬৬
বস্তুগত পরিকল্পনা এবং গৃহায়ণ	৪৫১	৩১৫	১৩৬
অন্যান্য	৯৪৪	৫৭৭	৩৬৭
মোট :	৪৪৫৫	৩৯৫২	৫০৩

সূত্র প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ছক-১ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয়কাঠামো (কোটি টাকায়) সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষি খাত নির্ভরতা নিম্নোক্ত ছকের তথ্যে স্পষ্ট (ছক-২) যা ফ্যাল্যান্ড ও পারকিন্সন-এর ১৯৭৬ সালের প্রকাশিত গ্রন্থ অনুসারে বিভিন্ন লেখায় প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধকালীন ধ্বংসযজ্ঞের অনেক বিবরণ পাওয়া গেলেও মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ নিরূপণ বা প্রকাশ করার কোনো সুযোগ নেই। এক হিসাব অনুযায়ী, মুক্তিযুদ্ধে ধ্বংসের কারণে ১৯৭০ সালের তুলনায় ১৯৭২ সালে মোট দেশজ উৎপাদন ৩০ শতাংশ কমে এসেছিল। ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট দেশজ উৎপাদন (বর্তমান বাজারমূল্যে জিডিপি) ছিল ৮৯৯ কোটি ডলার, যা মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থায় ১৯৭২ সালে কমে দাঁড়াল ৬২৯ কোটি ডলারে (ফাহাদ ২০১৮)। ১৯৭২-৭৩ সালে অর্থনীতির পুনর্গঠনের চাকা সচল হওয়া শুরু করে যখন দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৭০২ মিলিয়ন ডলার। যদিও ঐ পরিস্থিতিতে তৎকালীন সরকার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছিল, তথাপি পরবর্তী দুই বছরে অর্থনীতির গতি সচল হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল।

ছক-২ স্বাধীনতাপূর্ব ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (মিলিয়ন ডলারে)

	১৯৬৯-৭০	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৪-৭৫
কৃষি	৩,৯৮০	৩,৪০৩	৩,৭৮৮	৩,৭১৩
শিল্প	৫৩৫	৪১২	৪৭৩	৪৬৭
নির্মাণ	২৯৭	২১৫	৯৩	২২০
বিদ্যুৎ ও গ্যাস	১৫	১৮	৩২	৩৩
পরিবহণ	৩০০	৩০০	৩২৭	৩২৭
বাণিজ্য	৪৮৩	৪৩৯	৪৯০	৪৯১
গৃহায়ণ	২৮৭	২৯৫	৩০৩	৩১২
জনপ্রশাসন	১৫৮	১৭৪	২৪৩	৩০৮
ব্যাংকিং ইনসিওরেন্স	৩২	৪১	৪২	৪৪
অন্যান্য	৩৯২	৪০৪	৪০৮	৪১২
মোট	৬,৪৭৯	৫,৭০২	৬,২০০	৬,৩২৫

ফ্যাল্যান্ড ও পারকিন্সন, ১৯৭৬-এর তথ্য অনুসারে।

সাইদুজ্জামান (২০১৮) লিখেছেন, ১৯৭৫ সালের শুরু থেকে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বাড়তে শুরু করল, কারণ বিদেশি সাহায্যর সদ্ব্যবহার হচ্ছিল। কৃষি উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়ছিল, বৈদেশিক সাহায্যের সঠিক ব্যবহার বাড়ছিল, মূল্যস্ফীতি কমে আসছিল। ১৯৭২ সালে মূল্যস্ফীতি ছিল ২০ শতাংশ, যা ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৪ সালে বেড়ে হয়েছিল ৬০ শতাংশ, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে কমে হয়েছিল ৩৫ শতাংশ এবং ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সেটা আরো কমে এসেছিল। সত্যি কথা বলতে, আমাদের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় বঙ্গবন্ধুর 'জাতীয়করণের নীতি' রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, বুদ্ধিজীবী মহল, এবং অর্থনীতিবিদদের অনেকের কাছে গ্রহণীয় না হলেও, বঙ্গবন্ধুর সাংবিধানিক আদর্শ এবং 'পরিস্থিতিগত নেতৃত্ব' বা 'সিচুয়েশনাল লিডারশিপ'-এর সঙ্গে তার এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ ও সংগতিপূর্ণ।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন এবং উন্নয়ন ভাবনার প্রকাশ

রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর অনন্য অর্থনৈতিক দর্শন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে থেকেই। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত 'সোনার বাংলা' শুধু একটি স্লোগান ছিল না, বরং তার মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশকে উন্নয়নের উচ্চ আসনে দেখার অদম্য আকুতি ও সদিচ্ছা উচ্চারিত হয়েছে বারবার, প্রতিবার। বিশেষত, ছয় দফা কর্মসূচি বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সদিচ্ছার বলিষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ। এ সংক্রান্ত লেখনী ও প্রকাশনায় তা বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে। "বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন এবং 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো'র স্বপ্ন। অসংখ্যবার তিনি এ কথা উচ্চারণ করেছেন। তাঁর এই ব্যক্তিগত আবেগ প্রশ্নাতীত সত্য" (আকাশ ২০২০)।

বঙ্গবন্ধু শোষণবিরোধী ছিলেন। তিনি শ্রমিক শ্রেণি ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। অনুপার্জিত আয়বিরোধী ছিলেন এবং তিনি জনকল্যাণের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, কর্ম ও নিরাপত্তাকে বাজারের পণ্য নয় বরং প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট প্রদান করে সে সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর কারাগারের রোজনামচায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, " ... বাজেটে শিল্পপতিদের ১৯৭০ সাল পর্যন্ত 'ট্যাক্স হলিডে' ভোগের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। কিন্তু গরিব জনসাধারণ বোধহয় আর আলো জ্বালাইয়া রাতের খাবার খাইতে পারিবে না। খাবার জন্য কিছুই থাকিবে না" (মুজিবুর রহমান ২০১৭)। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা, ১৯৬৯-এর ১১ দফা এবং ১৯৭০-এর নির্বাচনি ম্যানিফেস্টোতে এসব কথা বারবার এসেছে। তবে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ছয় দফার মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির রূপরেখা নিহিত ছিল। এর তিনটি দফা– তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম দফা সরাসরি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলমন্ত্র উপস্থাপন করে। তৃতীয় দফা এদেশের জন্য ভিন্ন মুদ্রানীতি ও তার ব্যবস্থাপনার সুচিন্তিত রূপ। তৃতীয় দফা অনুসারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যা পারস্পরিকভাবে কিংবা অবাধে উভয় অঞ্চলে বিনিময় করা চলবে। অথবা এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একটি মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে এই শর্তে যে, একটি কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার অধীনে দুই অঞ্চলে দুটি রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। তাতে এমন বিধান থাকতে হবে, যেন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর কিংবা

মূলধন পাচার হতে না পারে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে আহরিত রাজস্ব এদেশেই ব্যয় হবার নিশ্চয়তা চাওয়া হয়েছে চতুর্থ দফায়, যা অনুসারে, রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে, তবে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজস্বের জোগান দেওয়া হবে। এদেশ থেকে আহরিত বৈদেশিক মুদ্রা এদেশেই ব্যবহৃত হবার নিশ্চয়তা চাওয়া হয়েছে পঞ্চম দফায়, যা অনুসারে, যৌথরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে, সেই অঙ্গরাজ্যের সরকার যাতে স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে তার পৃথক হিসাব রাখতে পারে, সংবিধানে সেরূপ বিধান থাকতে হবে।

সাইদুজ্জামান (২০১৮)-এর লেখা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের কিছু মধ্য-দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ছিল– যতটা সম্ভব দেশের সম্পদ ব্যবহার করে স্বনির্ভরতা অর্জন; বিদেশ ও দাতাদের কাছ থেকে শর্তহীন অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে স্বাগত জানানো এবং ক্রমান্বয়ে এ ধরনের নির্ভরতা হ্রাস করা। বেসরকারি খাতকে উপেক্ষা নয় বরং সময়োচিত গুরুত্ব দিয়েছেন। সাইদুজ্জামানের বক্তব্য অনুসারে, ১৯৭৪ সালের শুরুতেই বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ সীমা ২৫ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি টাকা করা হয়। কাজেই বেসরকারি খাতকে বঙ্গবন্ধু উপেক্ষা করেছেন, এটা কখনো বলা যাবে না।

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের শুরু থেকে বিভিন্ন ধারায় উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন। সংবিধানের প্রস্তাবনায় শোষণমুক্ত, সমাজতান্ত্রিক এক সমাজ গঠনের অঙ্গীকার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে– নাগরিকদের মানবাধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য ও সুবিচার নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া ধারা-১০-এ মানুষে মানুষে শোষণ নিরসন; ধারা ১৩-এ রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী এবং ব্যক্তি মালিকানায় সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা করা; ধারা ১৪তে খেটে খাওয়া কৃষক, শ্রমিক ও পিছিয়ে পড়া জনগণের শোষণ থেকে মুক্ত করা; এবং ১৫ ধারায় পরিকল্পিত উপায়ে রাষ্ট্র উৎপাদনশীল শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে নাগরিকদের জীবনের মান উন্নত করে খাদ্য, বস্ত্র, আবাসন, শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। ১৬ ধারাতে গ্রামীণ পর্যায়ে বিদ্যুতায়ন, কুটিরশিল্প, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ, শহর ও গ্রামের জীবনমানের বৈষম্য দূর করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। ১৭ ধারাতে গণমানুষের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা, আইন দ্বারা শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, এবং ১৮ ধারাতে বলা হয়েছে যে, পুষ্টির মান ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র। আর ১৯ ধারায় বলা আছে, নাগরিকদের সবাইকে সমান সুযোগের ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র (রহমান, ২০১৮)। সংবিধানের ২০ ধারায় উল্লেখ আছে, কাজের অধিকার, নিশ্চিত কর্মসংস্থান ও মজুরির ব্যবস্থাও করবে রাষ্ট্র, এবং রাষ্ট্র বেকার, অসুস্থ প্রতিবন্ধী, বিধবা, বয়স্ক ও অন্যদের সামাজিক সুরক্ষা দেবে।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা-পূর্ব এবং পরবর্তী বিভিন্ন পদক্ষেপ বলিষ্ঠভাবে ইঙ্গিত করে– বাংলাদেশের জাতির জনক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির শোষণমুক্ত ব্যবস্থাকে ধারণ করেছেন এবং কল্যাণমুখী গণতন্ত্রের মধ্যে এক শোষণমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন। সাইদুজ্জামানের ভাষায়, 'বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন ছিল রাষ্ট্রের উন্নয়নে সমাজতান্ত্রিক ও সমতাবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা; যা সংবিধান অনুসারে বাধ্যতামূলক। এ দর্শনের পেছনে ছিল বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা। গ্রামগঞ্জে ঘুরে কৃষক-শ্রমিকের দারিদ্র্য, জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা

সম্পর্কে অবগত হওয়া, হেঁটে-রিকশায়, রেলের তৃতীয় শ্রেণিতে ভ্রমণ করে অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া, কীভাবে তদানীন্তন পূর্ব বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যায় এমন একটি পরিস্থিতিতে, যখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সব কর্মকান্ড ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।' (সাইদুজ্জামান ২০১৮)। এম এম আকাশ বর্ণনা করেছেন '... তাঁর অর্থনৈতিক দর্শন ছিল সোশ্যাল ডেমোক্রেসি বা কল্যাণ ধনতন্ত্রের দর্শন। তাঁর এই দর্শন বাংলাদেশের সংবিধানের আদি অসংশোধিত রূপের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই '৭২-এর সংবিধান কার্যকরী করা সম্ভব হলে তাঁর অর্থনৈতিক দর্শন কার্যকরী হবে ...বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা চিরসবুজ আছে এবং থাকবে।' (আকাশ ২০২০)।

বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শনে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় বাজেট দেওয়া হয় ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে যখন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেট উপস্থাপন করেন, এখন সেই বাজেট গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকায় (২০২০-২১)। বাংলাদেশ সরকার এর 'বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন' সাইটে বিশ্বব্যাংকের সূত্র উল্লেখ করে উপস্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার অর্জনগুলো যা অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনুকরণীয় । জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) ২০১৮ সালের ১৫ মার্চ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক– এ তিনটি সূচকের যে-কোনো দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদণ্ডেই উন্নীত হয়েছে। সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের পথে এটি একটি বড়ো অর্জন, যেখানে অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন কৌশল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শনের মূল স্তম্ভ এবং তাঁর কৃষি ও শিল্পের সমন্বিত বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীনতা উত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য কৌশল হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

বর্তমান উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কৌশলের মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংমিশ্রণ স্পষ্ট। বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। জন্মের ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ দ্রুতগতিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মতো সফলতা দেখাতে পেরেছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানীমুখী শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাকশিল্প, ঔষধশিল্প, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসংক্রান্ত নানা অর্থনৈতিক সূচক অর্জিত হয়েছে, অর্জিত হবার পথে, বা স্থান পেয়েছে পরিকল্পনায় । পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ দেশের অর্থনৈতিক শক্তির পরিচায়ক।

যুদ্ধবিধ্বস্ত, প্রায় সর্বক্ষেত্রে অবকাঠামোবিহীন বাংলাদেশের গত এই ৫০ বছরের অর্জনের পরিসংখ্যান অনেক ক্ষেত্রে অনুকরণীয়। মোট দেশজ উৎপাদন, বিনিয়োগ, রাজস্ব, রপ্তানি আয়, রেমিট্যান্স, রিজার্ভ, বিদ্যুৎ– সব ক্ষেত্রেই রয়েছে উল্লেখ করার মতো সাফল্য । বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের পাশাপাশি প্রসার ঘটেছে আবাসন, জাহাজ, ওষুধ, ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য শিল্পের। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় যোগ হয়েছে জাহাজ, ওষুধ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী। বাংলাদেশের আইটি শিল্প বহির্বিশ্বে অভূতপূর্ব সুনাম কুড়িয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের বিস্তৃতি বাংলাদেশের অন্যতম অর্জন। সরকারি ক্রয়প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা, শিশু মৃত্যুহার কমানো এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ দেশের উন্নয়নের সিঁড়িকে মজবুত করছে। শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ হিসেবে তার স্থান করে নিয়েছে। নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, এবং নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি কার্যক্রম। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে গৃহীত হয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ। নারীর ক্ষমতায়নে দেশের হয়েছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। পোশাকশিল্পে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ আর এই শিল্পের সিংহভাগ কর্মী হচ্ছে নারী। ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশে গ্রামীণ উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে বড়ো অংশ নারী। জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত করার কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে শিশুদের সার্বিক অধিকারকে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভূষিত করা হয়েছে জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ডে। নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন যথার্থই মন্তব্য করেছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেবার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের– যার মধ্যে শিক্ষা সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার ও জন্মহার কমানো, গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার ও স্বাস্থ্যসুবিধা প্রদান এবং শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম অন্যতম।

বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রঋণের ব্যবহার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে তার ভূমিকার জন্য প্রশংসিত হয়েছে। এ ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের আওতায়, হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করতে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুস্থ মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃকালীন ভাতাসহ ভাতার হার ও আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু খাদ্য সমস্যা সমাধান এবং দারিদ্র্য বিমোচনকে তার উন্নয়ন কৌশলে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। দারিদ্র্য মুক্তিতে বঙ্গবন্ধুর দর্শন আলোচনায় তুলে এনেছেন সাংবাদিক মুস্তফা মনওয়ার তাঁর 'বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মতবাদ : উন্নয়ন ও প্রগতির পথনির্দেশক' গ্রন্থে। তাঁর ভাষায় 'উন্নয়নশীল দেশের অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন এখনো প্রাসঙ্গিক। মৌলিক চাহিদা মেটাতে সরকারের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত, সামাজিক সূচকে আমাদের কেমন অগ্রগতি অর্জন করতে হবে, বিশ্বমানের মানবসম্পদ কীভাবে গড়ে তোলা সম্ভব তার সবই রয়েছে জাতির

জনকের অর্থনৈতিক দর্শনে। রাষ্ট্রীয়ভাবে দারিদ্র্যমুক্তির লড়াইয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-ভাবনা শুধু বাংলাদেশেই প্রাসঙ্গিক তা নয়, পিছিয়ে পড়া অন্য জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য হতে পারে পথ নির্দেশিকা।' (মনওয়ার ২০১৯)। বর্তমান সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবস্থা করেছে, যা বঙ্গবন্ধু বারবার উচ্চারণ করেছেন। গ্রামীণ ঋণের জন্য বঙ্গবন্ধু সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছিলেন, খাদ্যনিরাপত্তা, মানব উন্নয়ন, কাজের স্বাধীনতা– এই বিষয়গুলো বারবার এসেছে বঙ্গবন্ধুর কথায়, পরিকল্পনায় এবং উন্নয়ন কৌশলে।

সংবিধানের অঙ্গীকার এবং স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো বিবেচনা করলে এ কথা সহজবোধ্য যে, বাংলাদেশ বর্তমানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকগুলোতে যে সাফল্য অর্জন করে চলেছে, তার গোড়াপত্তন করে গেছেন বঙ্গবন্ধু তাঁর নেতৃত্বে প্রণীত শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সংবিধানে ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়। জাতির পিতা তাঁর জীবদ্দশায় যে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সূচনা করেছিলেন তার সুফল পরিলক্ষিত হচ্ছে । আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার মতো পরিবর্তন চোখে পড়ছে। অর্থনীতির এই সমৃদ্ধি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে অনেকটাই আত্মনির্ভরশীল করেছে এবং উন্নয়ন অংশীদাররাও বাংলাদেশকে সমীহ করে চলতে বাধ্য হচ্ছে। এ অর্জন বঙ্গবন্ধুর স্বনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি গড়ার স্বপ্নের পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা। বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনায় দেশের মাটি থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের স্বদিচ্ছা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা সুস্পষ্ট । বঙ্গবন্ধুর ভাষণে ও অর্থনৈতিক দর্শনে সে আত্মমর্যাদার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে , উনি বলতেন 'ভিক্ষুক জাতির কোনো ইজ্জত নাই। আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে জাতি হিসেবে' (মিজানুর রহমান সম্পাদিত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ১৯৮৯)।

বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনে বাংলাদেশের অবহেলিত, ক্ষুদ্র ও কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন

আজকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জনে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন এবং কৃষিজ উৎপাদনের সাফল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন এবং কৃষিজ উন্নয়নের বিষয়টি দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্যনিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এবং কৃষক, শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে কৃষি উৎপাদন, কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, এবং অবহেলিত জনপদকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ। বিষয়গুলো মূলত বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তার হাতে স্থাপিত উন্নয়ন ভিত্তির হাত ধরে পেয়েছে আজকের বাংলাদেশ। এবং এসবের প্রেক্ষাপট ও উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তি রচিত হয়েছে স্বাধীনতার অনেক আগেই বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে। বঙ্গবন্ধু ১৯৫৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৭ সালের ৩০ মে পর্যন্ত তদানীন্তন কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করেন, যা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) নামে তৃণমূল পর্যায়ে শিল্পায়ন কার্যক্রম জোরদারে অবদান রাখছে, এবং বিসিকের মাধ্যমে ইতিমধ্যে গ্রামগঞ্জে হাজার হাজার শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়েছে (শিল্পমন্ত্রীর বক্তব্য, ১০ই সেপ্টেম্বর ২০২০, ইউএনবি নিউজ)।

অবহেলিত জনপদের দুঃখ লাঘব বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সব সময় গুরুত্ব পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু ছাত্রজীবন থেকে সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ছিলেন তৎপর। পাকিস্তানের গোয়েন্দাদের হাজার হাজার পৃষ্ঠার গোপন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই তিনি তরুণদের সংগঠিত করতে শুরু করেছেন এদেশের কৃষক, শ্রমিক তথা খেটে খাওয়া মানুষের খাদ্যসংকট ও অন্যান্য মোকাবিলার দাবিকে কেন্দ্র করে। আজীবন তিনি গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা স্বচোখে দেখেছেন। জেলে থাকা অবস্থায় গরিব-দুঃখী কারাবন্দিদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছেন এবং তাদের কষ্ট অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা এই গরিব-হিতৈষী অনুভবের দুটি জীবন্ত দলিল (রহমান, ২০১৮)। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দারিদ্র্য দূরের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যান বঙ্গবন্ধু। ভূমি ব্যবস্থাপনায় আমূল সংস্কার, শিল্প বিকাশে নয়া উদ্যোগ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্রদান, কৃষির আধুনিকায়নে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ, সমবায় চেতনা বিকাশে শুরু করেছিলেন কর্মযজ্ঞ। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়া, মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা, নারী জাগরণ কর্মসূচি ছড়িয়ে দিতে সব সময় বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় ছিল সাধারণ জনগণ। পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় আনতে গ্রহণ করেন নানা পদক্ষেপ (মনওয়ার ২০১৯)।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশের মানুষের নির্ভরতা ছিল মূলত কৃষি খাতের ওপর। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষ্যে ২৮ অক্টোবর ১৯৭০ সালে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন, 'একটা স্বল্প সম্পদের দেশে কৃষিপণ্যের অনবরত উৎপাদন হ্রাস পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে না, দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সব প্রচেষ্টা নিতে হবে। চাষিদের ন্যায্য ও স্থতিশীল মূল্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।' বাংলাদেশে স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ২৬শে মাঁচ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে তিনি বলেন, 'আমাদের চাষি হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য উদ্যোগের বড়ো অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে (রাজ্জাক, ২০২০)। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি খাতের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু কৃষি সমবায়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং সমবায়ের আন্দোলনকে কৃষিবিপ্লব বাস্তবায়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সময়ের কারণে সমবায় নিয়ে তার চিন্তাভাবনাগুলো বাস্তবে রূপ দিতে পারেননি। সরকার সমবায় ধারণাকে গ্রামীণ উন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে একীভূত করে চালু করেছে 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প, যা গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমিত সম্পদের ব্যবহার বাড়িয়ে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। গ্রামীণ মানুষের সঞ্চিত মূলধন কীভাবে আরো উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করা যায়, সে উদ্দেশ্যে আর্থিক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কৃষিনির্ভরতার ফসল ঘরে তুলছে আজকের বাংলাদেশ।

কৃষি খাতের পাশাপাশি শিল্প খাতের উন্নতির লক্ষ্যে সারা দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিল্পোদ্যোগ ছড়িয়ে দিতে প্রয়াস নিয়েছিলেন। মেগা শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ছাড়া শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব নয়- তা বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনায় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বড়ো শিল্পের জাতীয়করণের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ

প্রদান এক্ষেত্রে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কুটির শিল্প, পল্লির শিল্প এবং ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়নে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল পরিকল্পনা কমিশন এবং বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে বিসিক বা বিএসসিআইসি থেকে 'বাংলাদেশ কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন' বা বিএসআইসি এবং 'বাংলাদেশ স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন' বা বিসিআইসি গঠন করা হয় (১৯৭৫ সালে আবার একীভূত করা হয়েছিল)। এর মাধ্যমে বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠা, ব্যাংক থেকে ঋণ প্রাপ্তি, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। পরিকল্পনার আওতায় কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প, পল্লিশিল্প, তাঁতশিল্প, লবণশিল্প, এবং বাঁশ ও বেতশিল্পে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক অর্থনীতি ও শিল্পনীতি এবং তার অসম বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে দুই দশক সংগ্রাম করেছেন, প্রাদেশিক মন্ত্রী থাকাকালে শিল্পায়নের দুরবস্থা ও বৈষম্য থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করেছেন, এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থ ও শিল্পায়নের পরিকল্পনায় তা কাজে লাগিয়েছেন যথার্থভাবে, তা নির্দ্বিধায় বলা যায় (কাশেম ২০১৯)।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে দেশের অর্জন কম নয়। দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত কৃষি, যা স্বাধীনতার পর থেকে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান প্রায় ১৩ ভাগ– সংখ্যার বিচারে কম মনে হলেও সাধারণ মানুষের নির্ভরতা ও খাদ্য সরবরাহের বিচারে এ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তাসহ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল এদেশের মানুষ। আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল ভিত্তি কৃষি। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে দেশ প্রয়োজনীয় খাবারের বেশি উৎপাদন করছে এবং খাদ্যব্যবস্থায় ভারসাম্য, গুণমাণ ও পুষ্টির মতো বিষয়গুলোর দিকে নজর দিচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের বিকাশ শিল্পোন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। সরকার দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের হাতিয়ার হিসেবে এসএমইকে স্বীকৃতি দিয়েছে। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার জন্য সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রচার, বিস্তৃতি এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে একজন সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করছে। এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এসএমই খাতের বিকাশ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে 'এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট' নামে একটি বিভাগ খোলা হয়। এ খাতের উন্নয়নের জন্য ২০১০ সালে একটি বিস্তৃত এসএমই ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এসএমই ঋণ কার্যক্রম কঠোর নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। এ নীতিমালায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। দেশের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরকারি নীতিমালা ও নিজস্ব কর্মসূচি অনুযায়ী ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে।

বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ উন্নয়ন দর্শন-মন্তব্য

স্বাধীন বাংলাদেশে বৈষম্যমূলক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে এদেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় প্রত্যয় ও তাঁর অন্তর্ভুক্তিমূলক সমৃদ্ধির দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৭২ সালে প্রণীত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে এবং দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির প্রেক্ষাপটে সাজিয়েছেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে। দারিদ্র্য বিমোচন ও সমতাকে প্রাধান্য দিয়ে কৃষি ও শিল্প উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছেন। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের পথ নির্ধারণ করেছেন। সরকারি ও বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করেছেন বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যের নিরিখে। তাঁর সুচিন্তিত পদক্ষেপ স্বাধীনতার অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে শুরু করেছিল। সে পথ ধরে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ এগিয়েছে অনেক দূর, সাফল্য পেয়েছে অনেক।

বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ উন্নয়ন দর্শনে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক দর্শনের দিক নির্দেশনা গড়ে দিতে পারে জাতির জনকের সোনার বাংলার স্বপ্নকে। কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের টেকসই উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত : সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। অনেক সফলতার মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের এই মূল দিকগুলোতে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনতে জাতির জনকের শোষণ মুক্ত সমাজের চিন্তা চেতনাকে ধারণ করা আবশ্যক। আজকের অনেক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সফলতা বলে দেয়, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক চিন্তা, পরিকল্পনা, কর্মসূচি, কৌশল, ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি আজকের বাস্তবতায়ও কার্যকর।

তথ্যসূত্র

আকাশ, এম এম, ২০২০, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন, সমকাল, ১৭ই মার্চ ২০২০ সালে বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত, ঢাকা, বাংলাদেশ।

কাশেম, আবুল, ২০১৯, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন, জাতীয়করণ নীতি এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ফাহাদ, হাবিবুল্লাহ ২০১৮, চার যুগে ৪৫ গুণ বড় অর্থনীতি, ঢাকা টাইমস, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ফ্যাল্যান্ড ও পারকিন্সন, ১৯৭৬, বাংলাদেশ : দি টেস্ট কেস অব ডেভেলপমেন্ট, লন্ডন থেকে প্রকাশিত ।

মনওয়ার, মুস্তফা, ২০১৯, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মতবাদ : উন্নয়ন ও প্রগতির পথনির্দেশক, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মনায়েম সরকার (সম্পাদিত), ২০১৮, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি, দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মুজিবুর রহমান, শেখ, ২০১৭, কারাগারের রোজনামচা, বাংলা একাডেমি প্রকাশিত, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মিজান, মিজানুর রাহমান (সম্পাদিত), ১৯৮৯, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, নভেল পাবলিকেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সাইদুজ্জামান, এম , ২০১৮, স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন, বণিক বার্তা, অক্টোবর ৭, ২০১৮, ঢাকা, বাংলাদেশ।

রহমান, আতিউর ২০১৮, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক চিন্তা এবং উন্নয়ন অভিযাত্রা, সমকাল, ২৫ অক্টোবর ২০১৮ সালে বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত, ঢাকা, বাংলাদেশ।

রাজ্জাক, মো. আব্দুর, ২০২০, বঙ্গবন্ধুর কৃষি উন্নয়ন ভাবনা, বণিক বার্তা, আগস্ট ১৫, ২০২০, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন ও বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান : একটি সমীক্ষা

ড. রাজিয়া বেগম *

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কারিগর বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে এদেশে যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়েছে তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে এই গবেষণাকাজটি হাতে নেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমরা আজ উপলব্ধি করছি আমাদের লক্ষ্য, আমাদের অর্জন সর্বক্ষেত্রে তাঁর দিকনির্দেশনা আমাদের আত্মনির্ভরশীল করেছে। আমরা আমাদের ভিশন ও মিশনকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানুষের উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং ক্ষুদ্র শিল্প কীভাবে এদেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করেছে জানতে পেরেছি, যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি।

বর্তমানে এদেশ মিশ্র অর্থনীতির দেশ এবং এদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এখন এদেশের লক্ষ্য হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহকে বাস্তবায়নের জন্য দেশের সব ধরনের সম্পদকে কাজে লাগানো। বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ যার জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫। আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জন্মের পর থেকে যেসব দর্শন ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে গ্রাম উন্নয়ন, মানব উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, তরুণদের উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও শিল্প উন্নয়নের বিষয় রয়েছে। এ গবেষণায় এদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের কিছু চিত্র ও এতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কম মূলধন ও কমসংখ্যক কর্মী নিয়ে যেহেতু এসএমই খাত চলে সেহেতু এ খাতের টিকে থাকা নির্ভর করছে সময়মতো মূলধন পাওয়া ও সহজে বাজার পাওয়ার ওপর। এক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি সহায়তা পেয়েও চাহিদার তুলনায় জোগান কম হওয়া তাদের জন্য বড় হুমকি। এতৎসত্ত্বেও জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান ৩০ শতাংশ। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনামতো কাজ করে শুধু আমাদের মানবসম্পদ, শ্রম ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে একসময়ের তলাবিহীন ঝুড়ি আজ বিশ্ব মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, দেশের অর্থনীতি দ্রুত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতির পিতার দর্শন 'সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার' নিয়ে এদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

সূচনা : বাংলাদেশের প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের জাতির পিতার দর্শন কী ছিল? এবং সেগুলো কীভাবে কাজে লাগানো হয়েছে, এগুলো এখন এই প্রজন্মকে জ্ঞাত করা উচিত। তাঁর উন্নত দর্শন, সমৃদ্ধ চিন্তাভাবনা থেকে গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশে যে ব্যাপক আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়েছে তার অনেক চিহ্ন আমরা দেখতে পাই। যার ফলে এদেশের দারিদ্র্য, জনসংখ্যা ও নিরক্ষরতা দিনে দিনে

* ড. রাজিয়া বেগম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ ফ্যাকাল্টির মার্কেটিং বিভাগের প্রফেসর। তিনি ১৯৮৩ সালে এ বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। দীর্ঘ ৩৭ বছরের অধ্যাপনা ও গবেষণায় যুক্ত থেকে তিনি ৬০টির বেশি আর্টিকেল, ন্যাশনাল কারিকুলাম এন্ড টেক্স বুকবোর্ডের জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক বই লিখেছেন এবং ১৭টি পিএইচডি এবং এমফিল গবেষণা কর্ম সুপারভাইজ করেছেন। তাঁর পিএইচডি গবেষণার বিষয় ছিল নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন। তিনি সাধারণ পর্ষদ এবং পরিচালক পর্ষদের সদস্য হিসেবে দীর্ঘ ৮ বছর এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ডের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন ।

হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে এদেশের সন্তানেরা বিশ্বের দরবারে নিজেদের কর্মঠ ও মেধাবী পরিচয় দিয়ে দেশের নানাবিধ উন্নয়নে অংশ নিচ্ছে। মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারীরাও দেশের উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখছে। এদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে বিভিন্নভাবে তুলে ধরা যায়, এই গবেষণায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কীভাবে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে তা তুলে ধরা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কোনো দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র বলে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। আমাদের দেশের মানবসম্পদকে কাজে লাগাতে হলে তাদেরকে আত্মকর্মে উৎসাহিত করতে হবে। কাজ করলে আয় বাড়ে এবং সেই আয়কে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার আলো ছড়ানো যায়, সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন জাতি তৈরি করা যায়, নারীর ক্ষমতায়ন হলে সমতাভিত্তিক সমাজ তৈরি হয়। জাতির পিতার দর্শনকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। উন্নয়নশীল এদেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের যা আছে তা-ই নিয়ে উন্নতির চূড়ায় উঠতে হবে। আমাদের আছে বিপুল জনশক্তি, দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরি করার ক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দেশের জিডিপিতে, কর্মসংস্থানে, দারিদ্র্য দূরীকরণে, নারীর ক্ষমতায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এসএমইর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যেমন, এ খাত ব্যক্তিমালিকানাকে উৎসাহিত করে, অর্থনৈতিক কাজকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়, বর্তমান সরকার এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে নিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও চেম্বারসমূহ এ খাতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কী কী হুমকি ও কী কী সুযোগ আছে তা নির্ণয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, এ খাত দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্রে এই খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ৭ম খাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। (বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ২০১৭)

এই গবেষণায় গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যে পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে এসএমই খাতের উন্নয়নে যেসব কার্যাবলি হচ্ছে তাও উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্বোপরি আর্থসামাজিক উন্নয়নে এসএমই খাতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্যসমূহ

১) আর্থসামাজিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দর্শন জ্ঞাত হওয়া ও দেশের উন্নয়নে তা কীভাবে কার্যকর হয়েছে মূল্যায়ন করা।

২) আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলো জ্ঞাত হওয়া।

৩) বর্তমান টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো জ্ঞাত হওয়া।

৪) এদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)-এর অবদান মূল্যায়ন করা।

গবেষণার পদ্ধতি : বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন সমীক্ষাটিতে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন জানতে বর্ণনামূলক (Descriptive) গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে বর্ণনামূলক গবেষণা করা হলেও তথ্য ও উপাত্ত প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রাইমারি তথ্য উপাত্ত গ্রহণে কিছুটা সার্ভে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনটি জেলার প্রায় ৯৯ জনকে সুবিধাজনক নমুনা পদ্ধতিতে নেওয়া হয়েছিল। উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয় ও প্রয়োগযোগ্য পরিসংখ্যান টুলস ব্যবহৃত হয়েছে। সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন জার্নাল, যেমন– বিআইডিএস, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন রিপোর্ট, বিবিএস রিপোর্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক রিপোর্ট ও এসএমই ফাউন্ডেশন বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে। যে তিনটি জেলা নেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে, ঢাকা, ফরিদপুর ও মাদারীপুর। এ কাজে কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছিল আর তা হচ্ছে, মাঠ পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে বর্তমান করোনা পরিস্থিতি।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত :

১) বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর প্রধান দর্শনসমূহ :

ক) সমতাভিত্তিক অর্থনীতি তৈরিকরণ ;

খ) উন্নয়নমূলক সমাজগঠন ;

গ) সকলের জন্য সমান সুযোগ পাওয়ার 'অধিকার' নিশ্চিতকরণ ;

ঘ) নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সব মানুষের সমান অধিকার ;

ঙ) দেশ গঠনের চারটি মূল নীতি– জাতীয়তা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে (*বঙ্গবন্ধুর দর্শন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, বারকাত ২০২০)।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর এ দর্শনগুলো ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৭১-এ আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ১৯৭২-১৯৭৫ এদেশ গড়ার দায়িত্ব নেয়। 'সমতাভিত্তিক অর্থনীতি' তৈরি করার উদ্দেশ্যে নারী উন্নয়ন, তরুণদের উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নসহ গ্রাম উন্নয়নের মাধ্যমে এদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য নানামুখী কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। 'সামাজিক ন্যায় বিচার' ও 'সমতার অর্থনীতির' দর্শন নিয়ে স্বাধীনতার পর এদেশকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল, পরে আস্তে আস্তে জাতীয় উন্নয়নের জন্যই প্রাইভেট সেক্টরগুলোকে উৎসাহিত করা হয়। আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকার ধীরে ধীরে অর্থনীতিকে বিজাতীয়করণ করেন এবং সবার অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করেন এবং এ কাজের শুরুতে সরকার প্রথমে গ্রাম উন্নয়নের পদক্ষেপ নিলেন, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির সেবা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান তৈরি ও তার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ঋণসুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এভাবে সরকার বিভিন্ন মানব উন্নয়ন কার্যাবলিকে উৎসাহিত করে দেশকে এগিয়ে নিলেন। ১৯৭২-এ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন তৈরি হয় এবং দেশের উন্নয়নের জন্য আর্থসামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করেন। ঐ সময় বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শন ছিল 'সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার

প্রতিষ্ঠা করা'। মুজিবুর রহমান সরকার গঠনের দেড়-বৎসরের মাথায় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) গঠন করতে সক্ষম হলেন এবং এ পরিকল্পনাতে আত্মনির্ভরশীলতাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল (ফরাসউদ্দিন, টিভি টকশো ২০২০ নভেম্বর)। আত্মনির্ভরশীলতাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল বলে তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপও নেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছিল। এরই ফলে দেশ আজ 'মধ্যম আয়ের দেশে' রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে।

২) আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা :

(ক) আর্থসামাজিক উন্নয়ন ১৯৭০-১৯৮০ : বাংলাদেশের জাতির পিতার দর্শনগুলোর ওপর ভিত্তি করে ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হয়েছিল। নিম্নে এর কয়েকটি উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলো :

- কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে অর্থনীতির সকল দিককে পুনর্গঠন করা;
- বৈদেশিক সাহায্য কমানোর উদ্যোগ নেওয়া, গড়ে ৬০% থেকে ৩০% করা ;
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য কমানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা ;
- শহর ও গ্রামে আত্মকর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা;
- মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন বরাদ্দ হার বৃদ্ধি করা;
- সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিন্যাস করা;
- অত্যাবশ্যকীয় পণ্য উৎপাদন ও দাম সকলের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ;
- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কৃষিতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনা।

এদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রথম পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮)-এর জিডিপি উন্নয়ন হার ছিল ৫.৫ শতাংশ, তবে বাস্তবায়িত হয়েছিল ০৪ শতাংশ। মাথাপিছু জিডিপি উন্নয়ন হার ছিল ১.৩ শতাংশ। (বিবিএস ১৯৮০)

১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রাকৃতিক সমস্যার কারণে খুব সফল হয়নি বিধায় পরিকল্পনা কমিশন তাদের পরিকল্পনার বিভিন্ন ইস্যুতে কিছুটা পরিবর্তন করেছিল। পরবর্তী সময়ে অন্তবর্তীকালীন দুই বছর মেয়াদি নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যেমন–

- আর্থসামাজিক সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়া ;
- কৃষি উন্নয়ন করে জাতির উন্নয়ন করা;
- নিরক্ষরতা দূর করা, জনসংখ্যা কমানো, সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠা করা ;
- তরুণ ও নারী উন্নয়নের জন্য সুস্থ কর্মপরিবেশ তৈরি করা।

(খ) আর্থসামাজিক উন্নয়ন ১৯৮০-১৯৯০ :

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ১৯৮৩ সালে যেসব প্রোগ্রাম নিয়ে কার্যাবলি শুরু হয় তার প্রধানগুলো নিম্নরূপ :

- জাতীয় সম্পদের সমতাভিত্তিক বণ্টন, যাতে ধনী-গরিবের পার্থক্য কমে ;

- কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ;
- গ্রামীণ ব্যাংক তৈরি করা, ক্ষুদ্র শিল্পকে প্রাধান্য দেওয়া ;
- শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকরণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ ;
- জাতীয় উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ;
- প্রশাসনের পুনর্গঠন ও বিকেন্দ্রীকরণ।

* ১৯৮২ সালের সরকার 'নতুন শিল্পনীতি' তৈরি করেন। এর মাধ্যমে প্রাইভেট সেক্টরের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং কিছু নির্বাচিত পাবলিক সেক্টরকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। শিল্প উন্নয়নের স্বার্থে ৬৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রাইভেট মালিকানায় দেওয়া হয় যার ৫০ শতাংশই মৃতপ্রায় শিল্প ছিল। এক্ষেত্রে নতুন কৌশলও তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। (বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ঢাকা-১৯৯০ বিআইডিএস)

* এই পলিসিতে প্রাইভেট ও বৈদেশিক বিনিয়োগকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন, রপ্তানিমুখী ও শ্রমঘন শিল্পতে বেশি বিনিয়োগের সুযোগ থাকে।

* এ সময়ে পাবলিক ও প্রাইভেট সর্বত্র মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। কারণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এবং ১৫ শতাংশ চাকরি মহিলাদের জন্য রিজার্ভ রাখা হয়েছিল। যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন অবকাঠামো তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

(গ) আর্থসামাজিক উন্নয়ন (১৯৯০-২০০০) :

৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-১৯৯৫) এবং ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৫-২০০০) এই সময়ে ঘোষণা করা হয়। ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ও পদক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ :

- জিডিপির হার ৫ শতাংশে উন্নীতকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন ;
- মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য কমানো ;
- দেশের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করা।

* মহিলা ও যুবকদের জন্য সামাজিক কল্যাণের কয়েকটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে মানব উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল। 'গ্রাম্য সামাজিক সেবা'র মাধ্যমে বিভিন্ন প্রয়োজনভিত্তিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন– ঋণসহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন, আয়-বৃদ্ধিকরণ কাজ, প্রেষণা বৃদ্ধিকরণ, স্বাস্থ্য ও সামাজিক শিক্ষা। এ সময়ে নারী উন্নয়নের জন্য জাতীয় কাউন্সিল গঠিত হয়।

৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে গুরুত্বপর্ণ ছিল– দীর্ঘমেয়াদি আর্থসামাজিক পরিবর্তনকরণ, যাতে 'সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' তৈরি করা যায়।

- বৎসরে ৭ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকরণ, যাতে দারিদ্র্য কমানো যায় ;
- সনাতনি শ্রমকে প্রযুক্তিগত শ্রমে উন্নীতকরণ ;
- গ্রামে, শহরে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিকরণ ;
- বিজ্ঞানভিত্তিক দেশ তৈরিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ;

- জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরিতে প্রাইমারি ও কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া ;
- প্রয়োজনভিত্তিক সেবা খাত তৈরি করা ;
- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ কম সময়ে বেশি উৎপাদন ও উচ্চগুণ সম্পন্ন রপ্তানি পণ্য উৎপাদন করা ।

(উৎস : প্ল্যানিং কমিশন রিপোর্ট, প্ল্যানিং মন্ত্রণালয় ১৯৯০-১৯৯৮ ও ১৯৯৭-২০০২, বাংলাদেশ সরকার)

* এ সময়ে 'ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প' তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি উন্নত স্তরে চলে আসে। দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় ফলে সমগ্র দেশে বেকারত্ব হ্রাস পেতে থাকে। দেশীয় সম্পদ ও দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণকে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী করা হয়।
* নতুন উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়ানো হয় ।
* বড়ো ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে ছোটো শিল্পের উপচুক্তির ব্যবস্থা করা হয়।
* কৃষিভিত্তিক ও রপ্তানিভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিত করা হয়।
* উদ্যোক্তা উন্নয়নের তাত্ত্বিক সূত্র অনুযায়ী ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর ও কুটিরশিল্পের বাস্তবায়নের জন্য কয়েকটি কৌশল হাতে নেওয়া হয়–

(অ) এই ধরনের উদ্যোক্তা তৈরিতে প্রথমে 'প্রেষণাগত প্রশিক্ষণ' দেওয়া হয় ;

(আ) আগ্রহীদের 'শিল্প সহায়ক সেবা প্রদানের ব্যবস্থাপনা' প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ;

(ই) যারা ক্ষুদ্র শিল্প শুরু করতে পেরেছে তাদের ব্যবসায়কে এগিয়ে নিতে ও টিকিয়ে রাখতে 'প্রয়োজনভিত্তিক টিকে থাকার সহায়তা' প্রশিক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। এ কাজে 'বিসিক' অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে (উৎস : বেগম রাজিয়া (১৯৯৮), ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে বিসিকের ভূমিকা) ।

(ঘ) আর্থসামাজিক উন্নয়ন (২০০০-২০১০) :

আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য অন্যান্য দেশের মতো মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য ও দক্ষিণ এশিয়া উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনেও বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর দর্শনকে ভিত্তি করে কয়েকটি নীতিমালা তৈরি করে এবং নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য কিছু কৌশলগত পরিকল্পনা করে, যা নিম্নরূপ :

- সামগ্রিক অর্থনীতিকে সহায়তা দেওয়ার জন্য, ব্যক্তিমালিকানায় বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য কিছু নীতিমালা তৈরি করা হয় এবং এক্ষেত্রে আগ্রহীদের 'পরিবেশ সহায়তা' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয় ;
- এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো তৈরি হয় এবং সেবা খাতের উন্নয়নের সহায়তায় সরকার ও ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দেওয়া হয়, যেমন– এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন চেম্বার সুবিধা প্রতিষ্ঠান ;
- সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যালেন্স বা সমতা তৈরি করে দরিদ্র মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ করা হয় ;
- দরিদ্র মানবসম্পদকে অর্থনৈতিক সম্পদে রূপান্তরের জন্য শিক্ষার নানামুখী নীতিমালা ও কৌশল গ্রহণ করা হয় ;
- নারী ও প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে তাদের ক্ষমতায়নে অংশগ্রহণের জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয় ;

- স্থানীয় সরকার গঠনের মাধ্যমে দুর্নীতি দূর করার ও মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সঠিক সেবা যোগানের পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

(ঙ) আর্থসামাজিক উন্নয়ন (২০১০-২০২০) :

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দুইটি পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করেছে এবং বাস্তবায়নও করেছে যেমন- ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) ও ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)

ব্যাপক উন্নয়ন লক্ষ্য নিয়ে এই পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য হচ্ছে :

- বাংলাদেশের ভিশন ২০২১ ও মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা ;
- টেকসই ও জ্ঞানভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নয়ন করা ;
- বিশ্বপ্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য শিল্প উন্নয়ন করা ;
- ব্যাপক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া ;
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়কে সকল প্রকার ঋণসহায়তা প্রদান ;
- আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সঠিক সরবরাহসহ পর্যাপ্ত অবকাঠামো তৈরিকরণ ;
- নারী-পুরুষের সমতা বজায় রেখে 'পরিবেশবান্ধব' উন্নয়নকরণ ;
- খাদ্য ও বাসস্থান নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জনসংখ্যা কমানো ;
- বিশ্বব্যাপী 'ভালো সম্পর্ক' তৈরি করা।

টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা (SDGs) :

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)

টেকসই উন্নয়নকে লক্ষ্য রেখে এ পরিকল্পনাটি করা হয়েছে, যাতে সমতাভিত্তিক জাতীয় উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন সম্ভব হয়। বাংলাদেশের বয়স যখন ৫০ বছর হবে তখন যেন এদেশ 'মাধ্যম আয়ের দেশে' পৌঁছাতে পারে– এই ভিশন নিয়েই ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা এক্ষেত্রে UN-Port - 2015 Sustainable Development Goals (SDGs) অনুসারে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে আছে–

- অর্থনীতির উন্নয়নকে মজবুতকরণ ও প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশে উন্নীতকরণ ;
- সকলের জন্য 'পরিবেশ বান্ধব' পরিবেশ উন্নয়নকরণ ;
- ন্যূনতম গরিব ও বেকারত্ব একেবারে হ্রাসকরণ ;
- দক্ষতা ও জ্ঞানভিত্তিক/মেধাবী মানবসম্পদ উন্নয়ন ;
- নারীর ক্ষমতায়ন;
- মহিলা-পুরুষ সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণ ;
- সকলের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধশীল দেশ গড়া ;
- সমাজ, অর্থনীতি ও পরিবেশে ভারসাম্য তৈরিকরণ ও দুর্নীতি দূরীকরণ ;

- আইসিটি সেবা উন্নয়ন ও সরবরাহকরণ।

*উৎস:(https://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2019/07/Four-years-of-SDGs-in Bangladesh.pdf)

জাতিসংঘে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ ২০১৫ সালে ঘোষিত হলে তখন ১৭টি বিশ্বায়ন লক্ষ্য বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে, এর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথমে প্রধান ৯টি লক্ষ্য কীভাবে কার্যকরী করবে তা উক্ত পরিকল্পনায় নিয়ে আসে। ফলে বাংলাদেশ SDGs অর্জনে ১৫৭টি দেশের মধ্যে ১২০তম দেশে চলে আসে। *(https://iisd.org./topic./sustainable-development-goals)*

বাংলাদেশের এসডিজি সূচক স্কোরে দেখা যায়, প্রতিবেশী দেশকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে। এসডিজি সূচক স্কোর বাংলাদেশের ৫৬.২, যেখানে আফগানিস্তানের ৪৬.৪ এবং পাকিস্তানের ৫৬.৬। এসডিজি অর্জনে অনেক হুমকি/অসুবিধা নিয়েও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ দশকের বিভিন্ন পরিকল্পনায় এদেশের ব্যাপক আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়েছে।

সামাজিক দিকে উন্নয়ন :

বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমার সফলতার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক নির্দেশনাগুলোরও উন্নতি হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে কম পরিমাণ ভূমিকে নানাভাবে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সব মানুষের শ্রমকে আজ মানবসম্পদরূপে উন্নীত করার চেষ্টা চলছে। এজন্য নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। জনসংখ্যার দিক দিয়ে এদেশ অষ্টম বৃহৎ দেশ। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা দিনে দিনে কমছে। পাবলিক প্রাইভেট অংশীদারিত্ব বেড়েছে। বিশ্ব PPP (Purchasing Power Parity) টার্মে IMF বাংলাদেশকে ৪৩তম অর্থনীতির দেশ বলেছে। Goldman Sachs বর্তমান বাংলাদেশকে একবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়নশীল দেশ বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। গ্যাস রিজার্ভে এদেশ বিশ্বের ৪৭তম দেশ। মাথাপিছু আয় দিনে দিনে বাড়ছে। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৫ শতাংশের নিচে।

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের হার দিনে দিনে বেড়ে চলছে। বর্তমানে এ হার বৃদ্ধি পাচ্ছে ৭-৮ শতাংশ করে, যার ফলে শিঘ্রই এদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হতে চলছে, দারিদ্র্যও কমছে।

তালিকা-১ বাংলাদেশে দারিদ্য কমার হার নিম্নরূপ :

১৯৯১-৯২ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল ৪১.১ শতাংশ
২০১০-১১ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল ১৬.৫ শতাংশ
২০১১-১২ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল ১৫.৫ শতাংশ
২০১২-১৩ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল ১৪.৯ শতাংশ
২০১৩-১৪ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল ১৩.৭ শতাংশ
২০১৪-১৫ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল ১২.৯ শতাংশ
২০১৬-১৭ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল ১৭.৬ শতাংশ (উৎস : বিবিএস ২০১৭)

তালিকা-২ এদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে পরিকল্পনাভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিম্নরূপ :

পরিকল্পনাসমূহ	জিডিপি উন্নয়ন হার %	বাস্তবায়ন হার %	মাথাপিছু জিডিপি উন্নয়ন হার %
১ম (১৯৭৩-৭৮)	৫.৫	৪.০	১.৩
২য় (১৯৮০-৮৫)	৫.৪	৩.৮	১.৫
৩য় (১৯৮৫-৯০)	৫.৪	৩.৮	১.৬
৪র্থ (১৯৯০-৯৫)	৫.০	৪.২	২.৪
৫ম (১৯৯৫-২০০০)	৭.১	৫.১	৩.৫
৬ষ্ঠ (২০১১-২০১৫)	৭.৩	৬.৩	৪.৯

**উৎস : বিবিএস (বাংলাদেশ ব্যুরো অব এসটাটিসটিকস্) ১৯৮০ থেকে ২০১৭ রিপোর্ট*

'মাথাপিছু আয়' ছিল প্রতি আর্থিক বছর অনুযায়ী ১৯৭৮-এ ১১৬ আমেরিকান ডলার, ১৯৮৫-তে ১৫০ ডলার, ১৯৯০-এ ২২১ ডলার, ১৯৯৫-তে ২৪৭ ডলার, ২০০০-এ ৩৬০ ডলার, ২০১০-এ ৭৮০ ডলার এবং ২০১৫-তে ১২৩৫ ডলার (বিবিএস ২০১৭)।

'মানবসম্পদ' উন্নয়নের ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগেই মাথাপিছু আয় প্রতি বছর বেড়েছে। কিছু দক্ষ কর্মী বিদেশে কাজ করে এদেশের রেমিট্যান্স আয়ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। এর ফলে কর্মসংস্থানও বাড়ছে। অন্যদিকে বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০-এ রেমিট্যান্স আয় ছিল ১১.০ শতাংশ, ২০১২-এ ছিল ১৪.১৬ শতাংশ, ২০১৪-এ ছিল ১৪.৯৪ শতাংশ ২০১৬-এ ১৩.৬১%, ২০১৮-এ ১৫.৫৩% এবং ২০১৯-এ বেড়ে দাঁড়ায় ১৮.৩২%।

**(The Business Standard Report 02 July 2020 and 13Sep.2020)*

বঙ্গবন্ধুর 'আত্মনির্ভরশীল ও সমতাভিত্তিক অর্থনীতি' দর্শনের ভিত্তি ধরে আজ এদেশে বৈদেশিক বাণিজ্য আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭২-এ এ খাতের আয় ছিল ৫ শতাংশ, যা ২০১১-এ ২২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিমালিকানায় পোশাকশিল্পের উন্নয়নই রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন করেছে, এখানে ৮৫ শতাংশ মহিলা কর্মী কাজ করছেন। ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। অধিকসংখ্যক নারী বাড়ি থেকে বের হয়েছেন, নিজেরা আয় করছেন, ফলে নারীর ক্ষমতায়নও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে 'তরুণ উন্নয়ন' প্রোগ্রামে চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে– শিক্ষা, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়ন। 'তরুণ উন্নয়নে' আমাদের অর্জনও অনেক, ২০১৭-এ তরুণ শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার ছিল ৪০.৩ শতাংশ; এর মধ্যে পুরুষ তরুণদের শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার ছিল ৫৪.৪ শতাংশ এবং মহিলা তরুণদের শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ছিল ২৬.০৩ শতাংশ।

(উৎস : পপুলেশন সাইন্স আন্তর্জাতিক সেমিনার, ১ ডিসে. ২০২০)

'জাতীয় তরুণ উন্নয়ন নীতিতে' ২০২০-এ এসডিজি (SDGs) অর্জনের লক্ষ্য হিসেবে তাদেরকে ব্যক্তিমালিকানা-ভিত্তিক বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পে অংশগ্রহণের উদ্যোগ হিসেবে ১২.৯ মিলিয়ন চাকরিক্ষেত্র তৈরি করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। *(তরুণ উন্নয়ন পলিসি, ২০২০)* এই পলিসিতে আটটি কর্মসূচি হাতে নিয়ে তাদেরকে নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বসম্পন্ন অর্থনৈতিক শ্রম-শক্তিতে উন্নীত করা হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী শিক্ষা :

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, তাদেরকে পেছনে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব প্রায়। বঙ্গবন্ধুর দর্শন সকলের জন্য সমান সুযোগ পাওয়ার 'অধিকার' নিশ্চিতকরণ বিষয়টি আজ বাস্তবায়নের পথে। ২০১০-এ কর্মজীবী নারীর সংখ্যা যেখানে ১৬.২ মিলিয়ন ছিল, তা ২০১৭-এ বেড়ে ১৮.৬ মিলিয়ন হয়েছে। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপের রিপোর্ট ২০১৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ এখন ৪৭তম অবস্থানে আছে ১৪৪টি দেশের মধ্যে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শ্রম বাজার ও সমাজ গঠনে প্রতি বছর নারীর অংশগ্রহণ ও সফলতা বাড়ছে। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প– সব ক্ষেত্রে নারীর কর্মসংস্থান বেড়ে চলছে। ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা কর্মসূচিতে তাদের আত্মকর্মে উৎসাহ বাড়াতে সব পাবলিক ও প্রাইভেট ব্যাংকে আলাদা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 'জয়িতা' মহিলা সংস্থা ২০১৫ সালে ৭১ হাজার ২০০ নারীকে 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা' প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং আরো ২২ হাজার ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে উদ্যোক্তা তৈরি করার কর্মসূচি নিয়েছে। *(Financial Express 2020)*

২০১৭ সালে ৯০ শতাংশ মেয়ের প্রাথমিক স্কুলে অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়, যা ২০০৮-এ ৫৫ শতাংশ ছিল। উচ্চশিক্ষাতেও নারীদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও পুলিশ/আর্মি সব ক্ষেত্রে নারীরা সফলতা অর্জন করছেন। কৃষিক্ষেত্রেও তাদের অংশগ্রহণ উৎসাহজনক। *(Financial Express 2020)* ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে আইসিটি (ICT) ক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন :

মানবসম্পদকে কাজে লাগাতে হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিবেশ তৈরি করে তাদেরকে আত্মকর্মে উৎসাহিত করতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প জিডিপিতে, কর্মসংস্থানে, দারিদ্র্য দূরীকরণে, নারীর ক্ষমতায়নে প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়, এ খাত ব্যক্তিমালিকানাকে উৎসাহিত করে, মানুষের মুক্ত উদ্ভাবনীশক্তিকে প্রকাশ করে, গতিশীল অর্থনীতির মেশিন হিসেবে কাজ করে, পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে *(বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক বিবরণী ২০১৪-১৫)*। ২০১০ সালে ক্ষুদ্র শিল্প খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং এর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বায়নের এ যুগে দক্ষ, গতিশীল উদ্যোক্তা তৈরিতে নানামুখী চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন এবং সমস্যা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করা জরুরি। এসএমই কার্যাবলির সমন্বয় ও মূল্যায়নের জন্য এর একটি একক সংজ্ঞা প্রয়োজন ছিল, যাতে করে অর্থনীতিতে এর অবদান সঠিক মূল্যায়ন করা যায়। এই উদ্দেশ্যে 'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬' একটি একক সংজ্ঞা প্রদান করেছে।

তালিকা-৩, বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতি-২০১৬ অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

শিল্পের ধরন	বিনিয়োগের পরিমাণ (প্রতিষ্ঠানের জমি ও কারখানা ভবন বাদে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়) টাকা	নিয়োগকৃত কর্মচারীর সংখ্যা
কাটেজ শিল্প	১০ লাখের নিচে	১৫ জনের বেশি
মাইক্রো শিল্প	১০ লাখ থেকে ৭৫ লাখ	১৬ থেকে ৩০ জন
ক্ষুদ্র শিল্প ↓		
প্রস্তুতকরণ খাত	৭৫ লাখ থেকে ১৫ কোটি	৩১ থেকে ১২০ জন
সেবা খাত	১০ লাখ থেকে ২ কোটি	১৬থেকে ৫০ জন
মাঝারি শিল্প ↓		
প্রস্তুতকরণ খাত	১৫ কোটি থেকে ৫০ কোটি	১২১ থেকে ৩০০ জন
সেবা খাত	২ কোটি থেকে ৩০ কোটি	৫১ থেকে ১২০ জন
বৃহৎ শিল্প ↓		
প্রস্তুতকরণ খাত	৫০ কোটির বেশি	৩০০-এর বেশি
সেবা খাত	৩০ কোটির বেশি	১২০-এর বেশি

উৎস : জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬

এসএমই খাতের চাহিদা ও যোগান বিশ্লেষণ করা খুবই প্রয়োজন এবং কোন ব্যবসায়ীর কী চাহিদা এবং কোন প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়ে সহায়তা যোগান দিতে পারে সে বিষয়ে তাদের জানানো উচিত।

এসএমই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গৃহীত এসএমই নীতি কৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা, শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকার ২০০৭ সালে এই ফাউন্ডেশন তৈরি করেন। এই ফাউন্ডেশন শিল্পায়নে নারী ও সব শ্রেণির এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ এবং জাতীয় পর্যায়ে সুসংগঠিতকরণসহ এসএমই উন্নয়নে কাজ করছে। এই ফাউন্ডেশনের ভিশন হচ্ছে 'ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থান, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচন' এবং মিশন হচ্ছে 'মুজবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে বিদ্যমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে বহুমুখী কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সহায়তা প্রদান'। *(বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৮-১৯, এসএমই ফাউন্ডেশন)* এই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম হচ্ছে গবেষণা, পলিসি অ্যাডভোকেসি ও ক্লাস্টার উন্নয়ন, ফিন্যান্স এবং ক্রেডিট

সার্ভিসেস, মানবসম্পদ উন্নয়ন/ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও আইসিটি, বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসেস, প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা। এই ফাউন্ডেশন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তার কর্মপরিকল্পনার ৯৬.৭২ শতাংশ কাজ বাস্তবায়ন করেছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ বাস্তবায়নের হার ছিল ৮৯ শতাংশ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ২ হাজার ৩৮০ জন উদ্যোক্তাকে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২৫৭ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ৯ শতাংশ সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বাস্তবমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন, ঢাকাসহ আটটি জেলার বিভিন্ন ক্লাস্টারের ১ হাজার ১৪০ জন উদ্যোক্তাকে ৩৮টি প্রশিক্ষণ, ৮৯৬ জনকে পরামর্শমূলক সেবা প্রদান, আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধিতে ৬৮৯ জনের জন্য ৩৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করেছে। *(বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৮-১৯ এসএমই ফাউন্ডেশন)* এ প্রতিষ্ঠান চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকার কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ৫১টি বিভাগে ১৭৭টি এসএমই ক্লাস্টার আছে, যার মধ্যে ৬৯ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান আছে।

এসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক : বাংলাদেশ ব্যাংক এ খাতের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ খাতকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন লোন পলিসি তৈরি হয়েছে। ২০১০-এ আলাদা এসএমই উইনডো খোলা হয়েছে ২৩.৯৯৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে *(বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১১)*। সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান নানামুখী পদক্ষেপ দ্বারা এ খাতের উন্নয়ন, কৃষি খাতের উন্নয়ন ও নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে কাজ করেছেন, এখনো তা চলমান। উদ্যোক্তা ও ব্যাংকারকে একত্র করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। অপ্রচলিত শিল্পেও ঋণের ব্যবস্থা করেছেন।

জাতীয় অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান :

জাতীয় অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান পরিমাপ কিছুটা কঠিন, কারণ এ বিষয়ে সঠিক তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া অসুবিধা, বিভিন্ন গবেষণা থেকে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে জানা যায় যে, জিডিপিতে এ খাতের অবদান ২৫ শতাংশ *(এডিবি ২০১৬)*, ২০১৬ সালের এসএমই সংজ্ঞা অনুযায়ী সমগ্র এসএমই খাতের অবদান জিডিপিতে ২৭ শতাংশ, বাংলাদেশে ৭.৮ মিলিয়ন অর্থনৈতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে, যার মধ্যে এদেশে কটেজ ও মাইক্রো বেশি। শুধু ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান জিডিপিতে ৩০ (৬ষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা)। এদেশে কর্মসংস্থানের একটি বড়ো উৎস হচ্ছে– এসএমই খাত, প্রায় ২৪ মিলিয়ন লোক এ খাতে কাজ করে এবং অর্থনীতিতে তাদের অবদান ৩২ শতাংশ (শিল্পমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০ নভেম্বর ২০২০)। বিভিন্ন উৎস থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান নিম্নরূপ :

তালিকা-৪ এদেশের জিডিপিতে শিল্পের নিঃস্বার্থ অবদান

শিল্প খাতসমূহ	অবদানের হার বছরভিত্তিক						
	২০১০-১১	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
কৃষি	১৮.০১	১৬.৫০	১৬.০০	১৫.৩৫	১৪.৭৪	১৪.২৩	১৩.৩১
শিল্প	২৭.৩৮	২৯.৫৫	৩০.৪২	৩১.৫৪	৩২.৪২	৩৩.৬৬	৩৫.১৪
সেবা	৫৪.৬১	৫৩.১৫	৫৩.৫৮	৫৩.১২	৫২.৮৫	৫২.১১	৫৫.৩৮
এসএমই খাত	১৬.৮৬	১৭.৪৩	১৭.৬২	১৭.৯১	২৫.০০	২৭.০০	৩০.০০

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক রিভিউ ২০১৯; এডিবি ২০১৬; শিল্প মন্ত্রণালয় ২০২০; এসএমই ফাউন্ডেশন রিপোর্ট ২০২০।

উপরিউক্ত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, 'সমতাভিত্তিক সমাজ' তৈরিতে ও দেশের উন্নয়নে শিল্প তথা ক্ষুদ্রশিল্প ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম, যে স্বপ্ন জাতির পিতা অনেক বছর আগেই দেখেছিলেন।

উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই এসএমই নিজ নিজ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মে সমতা আনয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে বটে, তবে প্রায়ই কোনো না কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, যাতে করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তে প্রধান বাধাগুলো নিম্নরূপ পাওয়া গিয়েছে :

তালিকা-৫ প্রধান বাধার কারণ ও শতকরা হার

বাধাসমূহ	শতকরা হার (%)
সময়মতো প্রয়োজনীয় ঋণ প্রাপ্যতা	২৫%
বিদ্যুতের যোগান	১২%
দক্ষ শ্রমিকের স্বল্পতা	১০%
আইনগত সহায়তার অভাব	০৫%
সামাজিক দুর্নীতি	১০%
সুস্থ প্রতিযোগিতার অভাব	১০%
বাজারজাতকরণের জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব	১২%
কর প্রতিষ্ঠানের হয়রানি	০২%
করোনাকালে বাজারে চাহিদা হ্রাস	১০%
পরিবহণ/গুদাম সমস্যা	০৪%

উৎস : মাঠ পর্যায়ের কাজ (২০১৮ জুন - ২০২০ জুন)

উপরিউক্ত তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সময়মতো প্রয়োজনীয় ঋণ প্রাপ্যতা, বিদ্যুতের যোগান ও বাজারজাতকরণের জ্ঞানের অভাবই প্রধান সমস্যা। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি নানামুখী সহায়তা পেলে

এর সমাধান হতে পারে এবং বাজারজাতকরণের জ্ঞান ও দক্ষতার জন্য বিভিন্ন প্রকার বাজার ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ দেওয়া ও ব্যবসায় টিকে থাকার সহায়তা অতীব প্রয়োজন। বিসিক এ ব্যাপারে কটেজ ও মাইক্রো প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপক সহায়তা দান করছে। এক্ষেত্রে এসএমই নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের দেওয়া দিকনির্দেশনা ও সুপারিশ অনুসরণ করা যেতে পারে। যেমন– (ক) এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সম্পৃক্ত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিসিক থেকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের যথাযথ ফলোআপ এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী প্রশিক্ষণসমূহে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন করা, নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা বহুমুখীকরণে সহায়তা সময়ের দাবি। *(বেগম রাজিয়া, ২০১৮)* (খ) প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশন উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ওপর আরো বেশি গুরুত্ব দিতে পারে, আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কাজের আওতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে, পলিসি অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমকে আরো জোরদার করা, ভেনচার ক্যাপিটালের মতো অর্থায়নের নতুন ধারার বিষয়ে পলিসি অ্যাডভোকেসি করা *(রাজ্জাক, আবদুর ২০১৮)* (গ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের কাউন্সেলিং ও ইনকিউবেশন সার্ভিস ও ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংকের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করা *(আক্তার, বেগম ওয়াহিদা, ২০১৮)*

উপসংহার :

দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের ফলে এরই মধ্যে বিশ্বে বাংলাদেশ 'স্বল্প মধ্যম আয়ের দেশ' হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এসএমই-সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে এসএমই ফাউন্ডেশন। বর্তমান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এ ২০২৪ সালের মধ্যে জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান ৩২ শতাংশে উন্নীত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এসএমই ফাউন্ডেশন। এখন প্রয়োজন এসএমই খাতের সুষম ও টেকসই উন্নয়ন। সব বাধা অতিক্রম করে দেশের এসএমই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে এ খাতের সুষ্ঠু বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ নিজের অবস্থান শক্তিশালী করে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতিতে রূপান্তরিত হবে– এটা আমরা সবাই বিশ্বাস করি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও এসএমই খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বর্তমান সরকার এ খাতকে শিল্প উন্নয়নের চালিকাশক্তি বলে প্রাধান্য দিয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে এ খাত ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প রাস্তা নেই। বিশ্ব রোডম্যাপ ২০৩০ অর্জনে ব্যাপক কর্মসংস্থান ও নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া বিকল্প নেই।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে এদেশ বেশ কিছু উন্নয়ন-কৌশল অবলম্বন করেছে, এখন তার বাস্তবায়ন দরকার। এর জন্য প্রয়োজন অধিক প্রশিক্ষিত, উন্নত চিন্তাধারার মুক্ত উদ্ভাবনী ব্যবস্থাপনা কৌশল, ও সুষ্ঠু পরিবেশবান্ধব শিল্প পরিবেশ। গত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি বছরে গড়ে ৭ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছরে জিডিপি লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৮.১৩ শতাংশ। এ গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে বাংলাদেশ কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠিত

হবে, যা বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমাদের সব স্বপ্ন পূরণ হবে যদি আমরা বঙ্গবন্ধুর দর্শনগুলো ধরে রাখি এবং সেইমতো সব মানুষের তথা দেশের উন্নয়নে ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে সবাই মিলে কাজ করি। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ও বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া রাষ্ট্রীয় মূলনীতির বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রামী প্রত্যয় নিয়ে একাত্তরের মতো আবারও সংঘবদ্ধ হয়ে সবাইকে কাজ করতে হবে। *(আনিসুজ্জামান, এম, ১৯৯১)* তবেই এদেশ সোনার বাংলা হবে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি, প্রবন্ধাবলি ও রিপোর্টসমূহ

১. আনিসুজ্জামান, এম (১৯৯১) : *স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু*

২. এডিবি রিপোর্ট-২০১৬

৩. এসএমই ফাউন্ডেশন রিপোর্ট-২০২০

৪. বেগম রাজিয়া, (১৯৯৮) ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে বিসিকের ভূমিকা, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ জার্নাল, ঢাবি

৫. *বঙ্গবন্ধুর দর্শন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ* (২০২০), বারকাত, আবুল

৬. বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক বিবরণী ২০১১, ২০১৪, ২০১৫

৭. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক রিপোর্ট-২০১৯

৮. বিবিএস রিপোর্ট-২০১৯

৯. বিআইডিএস রিপোর্ট-১৯৭৫

১০. জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬

১১. প্ল্যানিং কমিশন রিপোর্ট-১৯৭৫ থেকে ২০২০

12. Moon, Monira Parvin (2020) Youth Development In Bangladesh : Prospects And challenges, *Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman*, Agricultural University.

13. Remittance inflow sees 11% growth in FY20. (2020, July, 2) *The Business Standard*.

14. State of Bangladesh Economy. (2020, January 02) *The Financial Express*.

15. Women Empowerment and SDGs in Bangladesh, (2020, March 9). *The Financial Express*.

হবে, যা বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমাদের সব স্বপ্ন পূরণ হবে যদি আমরা বঙ্গবন্ধুর দর্শনগুলো ধরে রাখি এবং সেইমতো সব মানুষের তথা দেশের উন্নয়নে ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে সবাই মিলে কাজ করি। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ও বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া রাষ্ট্রীয় মূলনীতির বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রামী প্রত্যয় নিয়ে একাত্তরের মতো আবারও সংঘবদ্ধ হয়ে সবাইকে কাজ করতে হবে। *(আনিসুজ্জামান, এম, ১৯৯১)* তবেই এদেশ সোনার বাংলা হবে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি, প্রবন্ধাবলি ও রিপোর্টসমূহ

১. আনিসুজ্জামান, এম (১৯৯১) : *স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু*

২. এডিবি রিপোর্ট-২০১৬

৩. এসএমই ফাউন্ডেশন রিপোর্ট-২০২০

৪. বেগম রাজিয়া, (১৯৯৮) ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে বিসিকের ভূমিকা, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ জার্নাল, ঢাবি

৫. *বঙ্গবন্ধুর দর্শন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ* (২০২০), বারকাত, আবুল

৬. বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক বিবরণী ২০১১, ২০১৪, ২০১৫

৭. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক রিপোর্ট-২০১৯

৮. বিবিএস রিপোর্ট-২০১৯

৯. বিআইডিএস রিপোর্ট-১৯৭৫

১০. জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬

১১. প্ল্যানিং কমিশন রিপোর্ট-১৯৭৫ থেকে ২০২০

12. Moon, Monira Parvin (2020) Youth Development In Bangladesh : Prospects And challenges, *Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman*, Agricultural University.

13. Remittance inflow sees 11% growth in FY20. (2020, July, 2) *The Business Standard*.

14. State of Bangladesh Economy. (2020, January 02) *The Financial Express*.

15. Women Empowerment and SDGs in Bangladesh, (2020, March 9). *The Financial Express*.

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন
পর্যটন ভবন (লেভেল ৬-৭), ই-৫, সি/১, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ই-মেইল: info@smef.gov.bd ওয়েব: www.smef.gov.bd
http://ijsmed.smef.gov.bd/

ISSN: 2305-7750